আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

মাসিক ১৮৭

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : www.sunnibarta.com

আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) হাফেজিয়া সা

স্থাপিত : ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

পোঃ পাঠান বাজার, উপজেলা : মতলব উত্তর, জেলা : চাঁদ

মুক্তহস্তে দান করুন

প্রিয় দেশী-প্রবাসী সুন্নী মুসলমান ভাই ও বোনেরা!
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস; "প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা নর-নারী সকলের জন্যই ফরয"। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের এই হাদীসকে কেন্দ্র করে চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) থানার অন্তর্গত ৪নং সাদুল্লাপুর ইউনিয়নে "আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) হাফেজিয়া মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

অতএব, দেশী ও প্রবাসী ভাই-বোনদের খেদমতে আরয- আপনাদের যাকাত, ফিতরা, সদকা, মান্নত এবং লিল্লাহ্ ফাণ্ড হতে 'আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) হাফেজিয়া মাদ্রাসা'র উক্ত খাতে দান করে সুন্নী দ্বীনী শিক্ষার সুযোগ দিন। খাতুনে জান্নাতের (রাঃ) উছিলায় আপনাদের সন্তানাদির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক। আপনার দান সরাসরি রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে।

আরযগুজার

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল (রাঃ)-এর পরিবারবর্গ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

নং- জেপ্রচা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

হাদিয়া টাঃ ১৫.০০

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রাঃ)
এম.এম.এম.এ-বিসিএস

সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
খতীব, গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল হাশেম
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশ।
ডঃ এ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়াল
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশ।

নির্বাহী পরিচালক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রব
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশ।
যুগ্ম পরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন : ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

যোগাযোগের ঠিকানা
আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রব, মোবাইল: ০১৭২০৯০৬৯৯৬
আলহাজ্ব মোঃ শাহ আলম, মোবাইল : ০১৬৭০৮২৭৫৬৮
গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা, মোবাইল : ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩
সহযোগী : মোঃ আবু তাহের, মোঃ ইব্রাহিম আলী,
মোঃ আবু সাইদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ

- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম. এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহ আলম
- আলহাজ্ব এ্যাডঃ দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী আশরাফী
- কাজী মাওঃ মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
- মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন
- আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান
- মোহাম্মদ হামিদুল হক শামীম (কাউন্সিলর)
- ফারুক আহমেদ আশরাফী
- এডভোকেট কামরুল হাসান খায়ের

সহযোগিতায়

- এ্যাডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন
- আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী
- আলহাজ্ব মোঃ জাকির হোসেন
- এ.কে.এম. হাবিব উল কুদ্দুস
- আলহাজ্ব আবু আক্তার ফকির
- মোঃ শহীদুর রহমান
- সুলতান আহমেদ
- মোঃ মফিজুর রহমান
- ইঞ্জিনিয়ার শাহ্ আলম বাদল
- মোঃ খলিলুল্লাহ
- আলহাজ্ব মোঃ শহিদুল্লাহ
- কাজী নুরুল আফসার মিন্টু
- আলহাজ্ব রশিদ আহম্মদ আজাদ
- মোঃ শরীফ
- হাজী আলী হোসাইন জাহাঙ্গীর
- সৈয়দ মোঃ নাঈম

প্রচারে ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, বাংলাদেশ
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৩০০০ (তিন হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত টাকা), কোয়ার্টার পৃষ্ঠা-৭৫০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com, Website: www.sunnibarta.com

সূচীপত্র

পবিত্র আশুরার ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য ---- ০৩

দরসে হাদীস : আহলে বায়তে রসূল কিশতিয়ে নূহ ---------- ০৭

মুহররম মাসে করণীয় ও শিক্ষণীয় ---- ১০

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)-এর কবিতায় হযরত ইমাম হুছাইন (রাঃ) ---- ১৩

হিজরি সন ঃ চেতনার ফল্গুধারা ---------- ১৫

সূফী তত্ত্ব ও সূফী সাধনায় ফানা ও বাকা ---------- ১৮

রাসূল (দ.)-এর রওজা যিয়ারতের হাদিস নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির নিরসন ঃ (২) ---------- ২২

আহকামুল মাজার কিতাবখানা ঈমান ও আকিদা বিশুদ্ধ করার হাতিয়ার ---------- ২৭

পবিত্র আশুরা ও হাফতনামা ---------- ২৯

কারবালা ---------- ৩২

- যে আমার রওযা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।
- যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো।
- যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে।
- যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসবে কিয়ামতে তার জন্য আমি সুপারিশকারী হব।

সম্পাদকীয়

২১ আশ্বিন ১৪২৩ ❖ ০৪ মহররম ১৪৩৮ ❖ ০৬ অক্টোবর ২০১৬

ফিরে এল আজ সেই মুহররম মাহিনা ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না

মুহররম মাসের মধ্য দিয়ে শুরু হল ১৪৩৮ হিজরির যাত্রা। মানব ইতিহাসে অনেক ঘটনার সাক্ষ্যবহ এ মাস। দুনিয়ায় অনেক অনেক নৃশংসতম হত্যাকান্ড ঘটেছে। কিন্তু কিছুকাল পর মানুষ তা ভুলে যায়। কিন্তু কারবালার ময়দানে নবী দৌহিত্র ইমাম হোসাইন, আলী আকবর, আলী আসগর, মুহাম্মদ, আউন, ইমাম হাসানের চার পুত্র, ইমাম হোসেনের বৈমাত্রীয় চার ভাইসহ নবী বংশের সদস্যদের শাহাদাত কাহিনী এখনও যেন চোখে ভাসে এবং শোকে হৃদয় ফাটে। ১৪ শত বৎসরের নবী প্রেমিকদের চোখের পানি একসাথে করলে হয়তো একটি সাগর হয়ে যেতো। কিয়ামত পর্যন্ত আরো যে কত অশ্রুসাগর সৃষ্টি হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। আজও ইমাম হোসাইন ও তাঁর পরিবার বেঁচে আছে নবীপ্রেমিকদের হৃদয়ের মনি কোঠায়।

যারা সেই নৃশংসতম হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তাদের নামগুলো যুগ-যুগ ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে। অথচ, কারবালার শহীদরা মুসলমান সমাজের চেতনার প্রতীক; প্রেরণার উৎস। কারবালার ঘটনা শুনে শুধু কান্না চাই না; নিতে চাই শিক্ষা। কারবালার শিক্ষা হল- স্বপ্ন সংখ্যক হলেও অন্যায়- অসত্যের নিকট আপোষ না করা। এ শিক্ষা বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার ও নীতি বিগর্হিত কার্যকলাপ কমে আসবে আর দেশও শান্তিপূর্ণ হবে; এগিয়ে যাবে উন্নয়নের দিকে।

পবিত্র আশুরার ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য

- অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম. এ. জলিল

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام، بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة، صلاة الليل»

অর্থ ঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "রমযানের রোযার পরে সবচেয়ে উত্তম রোযা হলো মুহররম মাসের (আশুরার) রোযা এবং ফরয নামাযের পরে সবচেয়ে উত্তম নামায হলো রাত্রিকালীন (তাহাজ্জুদ) নামায"। (মুসলিম শরীফ)

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার দিনের রোযা রাখলেন এবং ঐ দিনের রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন -ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই দিনটিকে তো ইয়াহুদী ও নাছারাগণ সম্মান করে। (আমাদের একদিনের রোযা তো তাদের সমতুল্য হয়ে যাচ্ছে)। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- "তাদের সাথে পার্থক্য করার জন্য - আমি যদি আগামী বছর থাকি- তাহলে ৯ তারিখেও অবশ্যই রোযা পালন করবো"। (মুসলিম শরীফ)

বিঃ দ্রঃ হিযরতের প্রথম বছরে রমজানের রোযা রাখা ফরয হওয়ার প্রেক্ষিতে আশুরার রোযা নফলে পরিণত হয়। ১১ হিজরী সনে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন- ইয়াহুদীরা মুহররমের দশম তারিখ ১ দিনের রোযা তো তাদের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এতে মনে হয় - আমরা তাদের অনুসরণ করছি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- আগামী বছর (১২ হিজরী) পর্যন্ত আল্লাহ পাক আমার দুনিয়াবী হায়াত বাকী রাখলে আমি অবশ্যই নয় তারিখেও রোযা রাখবো। কিন্তু পরবর্তী মুহররম ১২ হিজরী সনের পূর্বেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন - তোমরা মুহররমের ৯ম ও ১০ম তারিখে আশুরার নফল রোযা রাখো এবং ইয়াহুদীদের থেকে ভিন্নতা রক্ষা করো।

মাসয়ালা ঃ ইবনে হুমাম বলেছেন- দশ তারিখের আগের দিন ও পরের দিন সহ মোট তিনদিন নফল রোযা রাখা মোস্তাহাব।

মাসআলা ঃ শুধু দশ তারিখের এক দিনের রোযা রাখা ইয়াহুদীদের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে মাকরূহ হবে।

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه»

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা মোনাওয়ারায় হিজরত করে এসে (৯ মাস পর) দেখতে পেলেন- মদিনার ইয়াহুদীরা আশুরার দিনে একদিনের রোযা পালন করছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন - তোমরা এই দিনে রোযা পালন করো কেন? তারা বললো এটা এমন মহান দিন- যে দিনে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুছা আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতিকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরআউন ও তার অনুসারীদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাই হযরত মুছা আলাইহি সালাম এই দিনে নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ রোযা রাখতেন। আমরাও তাঁর অনুসরণে এই দিনে রোযা রাখি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করলেন "তোমাদের চেয়ে আমরা হযরত মুছার বেশী হক্বদার ও বেশী ঘনিষ্ট। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দিনে রোযা রাখতেন এবং উম্মতকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন"। (বুখারী ও মুসলিম)

মাসাআলা ঃ হযরত মুছা আলাইহিস সালাম মহররমের দশ তারিখে (আশুরার দিনে) নীল দরিয়া পার হয়েছিলেন ১২ লক্ষ মতান্তরে ৬ লক্ষ বণী ইসরাঈলকে নিয়ে। এটা ছিল হযরত মুছা (আঃ) ও তাঁর জাতির জন্য নেয়ামত প্রাপ্তি দিবস। তাই তিনি ও তাঁর উম্মত এই দিনে রোযা রাখতেন নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ। এই নিয়ম মদিনার ইয়াহুদীরাও পালন করতো।

আশুরার রোযার সূচনা হয়েছে আরও পূর্বে - হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকে। তিনিও এই দিনে মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুছা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ রহমত ও নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আশুরার দিনে নিজে রোযা রাখতেন এবং উম্মতকেও তা পালন করার নির্দেশ দেন। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন হযরত মুছা আলাইহিস সালাম ইয়াহুদীদের চাইতে আমদের বেশী ঘনিষ্ঠজন এবং আমরা মুসলমানরা ও তার বেশী হক্বদার। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইয়াহুদীরাই হযতর মুছা (আঃ) এর বেশি ঘনিষ্ট ও হক্বদার। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমরা বেশী হক্বদার ও বেশী ঘনিষ্ট। এর কারণ কি ? কারণ হলো-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণের সরদার। এক নবীর ঘনিষ্টতম হচ্ছেন আর এক নবী - কেননা তাঁরা সমগোত্রীয়। উম্মত হচ্ছে অনুসারী ও অনুগত। আর একটি কারণ হলো মি'রাজের রাত্রে হযরত মুছা আলাইহিস সালাম আমাদের ৪৫ ওয়াক্ত নামায কমানোর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুতরাং এর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ আশুরার রোযা পালন করা আমাদের জন্য - হিযরতের প্রথম বছর ছিল ফরয এবং দ্বিতীয় হিজরীর পর হতে কেয়ামত পর্যন্ত মোস্তাহাব। কাজেই আমাদের প্রতি হযরত মুছা আলাইহি সালামের এই ভূমিকার প্রতিদান স্বরূপ তার নাজাত দিবস পালন করার ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা ইয়াহুদীদের চাইতে বেশী হক্বদার।

মাসআলা ঃ আশুরার দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর। নীল দরিয়া অতিক্রম করার স্মৃতিচারণ করা নবীজীর সুন্নাত। ঘটনা ঘটেছিল একদিন, কিন্তু তার শুকরিয়া আদায় করতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসর। রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। এই দিনটি হচ্ছে বিশ্ব জগতের জন্য মহান রহমত নাযিলের দিন। খোদা তায়ালার এই বিশেষ নেয়ামতটি হচ্ছে ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত। স্মরণে যদি মুসলমানরা সে দিবসটি রোযার মাধ্যমে পালন করতে আইনত বাধা না থাকে- তাহলে বিশ্বজগতের রহমত, রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস প্রতি বৎসর পালন করা মুসলমানদের জন্য কেন অবৈধ হবে? এই দলীলটি পেশ করেছেন- বোখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তার বিশ্ব বিখ্যাত ফতহুল বারী শরহে বোখারী গ্রন্থে।

ওহাবী, দেওবন্দী, জামাত-সালাফী গং আল্লামা ইবনে হাজরের সমর্থিত মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানকে শিরক বিদ্‌আত, খৃষ্টানদের খৃষ্টমাসডে- আরও কত কি বলেছে। তারা মিলাদুন্নবীকে বন্ধ করার হীন উদ্দেশ্যে সিরাতুন্নবী নামে এক নূতন বেদআতি অনুষ্ঠান চালু কারার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুন্নী জনতার দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার মিলাদুন্নবী পালনের প্রশাসনিক নির্দেশ দিলেও তারা এখনও সিরাতুন্নবীতেই রয়ে গেছে এবং সরকারী আদেশ লংঘন করছে। এতেই প্রমানিত হয়- তারা নবীজীর শান মানের বিরোধী চক্র। এদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

৪। আশুরার দিনে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ নবী বংশের ২৩ জন আহলে বাইত সদসা এবং ৭২ জন হোসাইন ভক্ত অনুসারী - সর্বমোট ৯৫ জন নবী প্রেমিক এজিদের কবল থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তার বিরুদ্ধে জেহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাই আশুরার সঙ্গে যোগ হয়েছে শাহাদাতে কারবালা। মুসলমানদের কাছে আশুরার দিনে কারবালার শাহাদাতই বিশেষ গুরুত্ব পায়। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের রক্ত নবী করিম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষণ করে রেখেছেন- যা হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হুযুর সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রক্ত সংরক্ষণের কারণও স্বপ্নে

বলে দিয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাসকে। হাশরের দিনে তিনি এই রক্ত আল্লাহর দরবারে পেশ করবেন বলে স্বপ্নে ঘোষনা দিয়েছেন এভাবে-

"আমি ইমাম হোসাইনের রক্ত ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ত কেয়ামতের দিনে আল্লাহর দরবারে পেশ করবো"। অন্য রেওয়ায়াতে আছে- এই রক্তের উসিলা দিয়ে তিনি উম্মতের গুনাহ মাফ চাইবেন। সুবহানাল্লাহ !

গুনাহ করেছি আমরা - আর সেই গুনাহ মাফ হবে ইমাম হোসাইনের রক্তের উছিলায়। তাই এ শাহাদাতের সম্মানে প্রতি বছর আশুরার দিনে মিলাদ কিয়াম, দান খায়রাত, ইবাদত বন্দেগী করে ইমামে পাক ও তাঁর সঙ্গীদের রূহ মোবারকে সাওয়াব রেছানী করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। শরীয়ত সম্মত উপায়ে গুরুত্বের সাথে এই শাহাদাত দিবস পালন করতে হবে। শিয়াদের মনগড়া তাজিয়া, মর্সিয়ার মিছিল শরীয়ত কখনও সমর্থন করেনা।

পবিত্র মুহররম মাস অত্যন্ত ফজিলত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাসের দশম তারিখকে আশুরা বলা হয়। নিম্নে আশুরার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত বর্ণনা করা হল-

আশুরার দিনের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ঃ

১। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক লওহ ও কলমকে সৃষ্টি করেছেন।

২। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক জমিন এবং আসমানকে সৃষ্টি করেছেন।

৩। আল্লাহ তায়ালা আশুরার দিনে হযরত জিবরাইল আলাইহিচ্ছালাম, মোকাররাবীন, ফেরেশতা ও হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামকে সৃষ্টি করেছেন।

৪। আশুরার দিনে হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের তওবা কবুল হইয়াছিল।

৫। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হযরত ইদ্রিস আলাইহিচ্ছালামকে অতি উচ্চ সম্মান দান করেছেন

৬। আশুরার দিনে হযরত নূহ (আঃ) মহাপ্লাবন হইতে নাজাত পাইয়াছিলেন।

৭। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম আলাইহিচ্ছালামকে নমরুদের অগ্নিকুন্ড হইতে নাজাত দিয়াছিলেন।

৮। আশুরার দিনে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ আলাইহিচ্ছালামকে পিতার সহিত মিলিত করেছেন।

৯। আশুরার দিনে আল্লাহ তায়ালা হযরত আইউব আলাইহিচ্ছালামকে পরীক্ষা মূলক কঠিন ব্যাধি হতে আরোগ্য দান করিয়াছিলেন।

১০। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হযরত ইউনুছ আলাইহিচ্ছালামকে মাছের পেট হতে নাজাত দিয়াছিলেন।

১১। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হযরত মূসা আলাইহিচ্ছালামকে ফেরাউনের কবল হতে মুক্তি দান করেছিলেন এবং ফেরাউনকে নীল দরিয়ায় ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন।

১২। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হযরত মূসা আলাইহিচ্ছালাম ও বনি ইসরাঈলের জন্য নীল দরিয়ায় রাস্তা বানাইয়াছিলেন।

১৩। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হযরত দাউদ আলাইহিচ্ছালামের তওবা কবুল করিয়াছিলেন।

১৪। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলায় উম্মতের গোনাহ মাফ করার সুসংবাদবাহী আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন।

১৫। মাহে মুহররমের ১০ই তারিখ (আশুরার দিনে) কারবালার ময়দানে কুখ্যাত এজিদ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করিয়া হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন।

১৬। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতের দ্বারা আরশে আজীমের উপর জালোয়া বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৭। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আসমান হইতে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

১৮। মুহররমের ১০ তারিখেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

১৯। মুহররমের ১০ তারিখ বা আশুরার দিনে পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণ রোজা পালন করিয়াছিলেন।

২০। আশুরার দিনে যে ব্যক্তি রোজা রাখিবে, তাহার ৪০ বছরের গোনাহের কাফফারা হইয়া যাইবে।

২১। যে ব্যক্তি মহররমের ১০ই রাত্রে এবাদত করিবে আল্লাহ পাক ৭ আসমানের সমান ছওয়াব দান করিবেন। অর্থাৎ সমস্ত ফেরেশতাগণের সমান ছওয়াব পাইবে।

২২। যে ব্যক্তি আশুরার রাত্রে ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে প্রতি রাকআতে একশবার ছুরা ফাতেহা ও ৫০ (পঞ্চাশ) বার ছুরা এখলাছ সহ, আল্লাহ পাক তার আগের ও পেছনের ৫০ বৎসরের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

২৩। আশুরার দিনে যে ব্যক্তি গোসল করিবে- মৃত্যু ব্যতীত কোন সময় বিমার হইবে না।

২৪। যে ব্যক্তি আশুরার দিনে সুরমা ব্যবহার করিবে তাহার চোখের জ্যোতি কখনো নষ্ট হইবে না।

২৫। যে ব্যক্তি আশুরার দিনে এতিমের মাথায় হাত বুলাইয়া দিবে, সে যেন সমস্ত দুনিয়ার এতিমগণকে ভালবাসিল।

২৬। যে ব্যক্তি আশুরার দিনে কোন বিমারীকে দেখিল - সে যেন সমস্ত আদম সন্তানের বিমারীগণকে দেখিল। আশুরার দিনে যে কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খানা খাওয়াইল- সে যেন সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদীর মিসকিনকে পেট ভরিয়া খাওয়াইল।

২৭। আশুরার রাত্রে যে ব্যক্তি ২ রাকআত করিয়া ১০০ রাকআত সালাতুল খায়ের নামক নামায আদায় করিবে- প্রতি রাকআতে ১ বার ফাতিহা ও ১০ বার সূরা ইখলাছ পড়িবে- তার প্রতি আল্লাহ পাক ৭০ বার রহমতের নযর করিবেন। প্রতি নযরে ৭০টি মকসুদ পূর্ণ হইবে- যাহার সর্বনিম্ন হইল মাগফিরাত। (গাউছে পাকের কিতাব গুনিয়াতুত ত্বালেবীন)।

নারায়ে তাকবির
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে গাউছিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ [ﷺ]
ইয়া গাউছুল আজম দস্তগীর

গাউসুল আজম রেলওয়ে জামে মসজিদ

প্রতিষ্ঠাতা খতীব: উস্তাজুল উলামা, শায়খুল ইসলাম- অধ্য আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (র.)

নির্মাণ ও সংস্কার চলছে

আপনিও শরিক হয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন।

আরজগুজার

মুহাম্মদ শাহ্ আলম, নির্বাহী সভাপতি
০১৬৭০৮২৭৫৬৮

মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, সেক্রেটারী
০১৫৫২৪৬৫৫৯৯

গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

আহলে বায়তে রসূল কিশতিয়ে নূহ

- মুফতি মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عن ابى ذر رضى الله عنه قال وهو اخذ بباب الكعبة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول الا ان مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح عليه السلام فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك - رواه احمد-

অর্থাৎ: হযরত আবু যর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি পবিত্র কা'বাঘরের দরজা হাত দিয়ে ধরা অবস্থায় বললেন আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বায়তের দৃষ্টান্ত হযতর নূহ আলায়হিস সালাম'র জাঁহাজের মত। যে এতে আরোহন করেছে সে মুক্তি পেয়েছে, আর যে ইহা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সে ধ্বংস হয়েছে। (মুসনদে আহমদ : সূত্র : মিশকাত শরীফ ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

বর্ণনাকারীর নাম জুনদুব ইবনে জুনাদা। উপনাম 'আবু যর' সমধিক পরিচিত। গিফার গোত্রের লোক হিসেবে তাঁকে আল গিফারী বলা হত। ইসলামের সূচনালগ্নেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সিরাতের কিতাব সমূহে তাঁকে পঞ্চম মুসলমান হিসেবে গননা করা হয়। হিজরি পঞ্চম সনে তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় আগমন করার পর সর্বক্ষণ রাসূলে পাকের সাহচর্যে থাকতেন। যাতুর রিক্বা যুদ্ধে যাত্রাকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মদীনা শরীফের আমির নিযুক্ত করেন। একজন সাধক,পন্ডিত পাশাপাশি মিতব্যয়ী ও সংযমী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির চরম বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সর্বমোট ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইসলামের বহু খিদমদ আনজাম দিয়ে পরিশেষে হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফত আমলে হিজরি ৩২ সনে ৮ যিলহজ্বে ইনতিকাল করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র যমানার তুফান ইতিহাস বিখ্যাত এক ঘটনা। নূহ আলাইহিস সালাম'র প্রতি অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে মহান রব্বুল আলামীন সেই তুফানরূপী আযাবের ব্যবস্থা করেছিলেন। পাশাপাশি অনুগত উম্মতকে পরিত্রাণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি জাহাজ তৈরি শেষ হলে রজব মাসের দুই তারিখ প্লাবন আরম্ভ হয়। অনুগত উম্মত আর দুনিয়ার যাবতীয় পশু-পাখীর এক জোড়া করে এবং বিভিন্ন প্রকার ফল-মূলের গাছের চারা ওই জাহাজে উঠানো হলো। সে দিন যারা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র সেই জাহাজে আরোহণ করেছিলেন বা করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন পক্ষান্তরে যারা এতে আরোহণ করেনি তারা জ্বলোচ্ছাসে ডুবে মরেছিল। এমনকি ওই ডুবন্তদের মধ্যে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র এক স্ত্রী ও পুত্র কেনানও ছিল। কারণ, তাদেরকে বারবার বলার পরও জাহাজে আরোহণ করেনি। দীর্ঘ ছ'মাস পর তুফান শেষ হল আর অবাধ্যরা ধ্বংস হয়ে গেল।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র উম্মতের উপর যেমন তুফান এসেছিল শেষ যামানায় উম্মতের উপরও তুফান আসতে পারে এটা নিশ্চিত জানতেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম। তবে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র উম্মতের তুফানটা ছিল বাহ্যিক তথা প্রকাশ্য; কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীর উপর তুফানটা হবে অপ্রকাশ্য। তাদের ঈমান-আকিদার উপর বয়ে যাবে সেই মহাপ্লাবন। সে প্লাবনের শ্রোতে হারিয়ে যাবে অনেকের মূল্যবান ঈমান। তাই অনেক আগেই পবিত্র হাদীস শরীফের বাণীতে উম্মতে মুহাম্মদীর ধ্বংসাত্মক তুফান হতে মুক্তির ঠিকানাও দেখিয়ে গেছেন দয়াল নবী রহমাতুল্লিল আলামীন সরকারে দু'আলম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী করীম ইরশাদ করেন, প্লাবন হতে রক্ষাকল্পে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যেমন মুক্তির জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন; আমিও তেমনি আমার বিপদগ্রস্ত উম্মতের জন্য মুক্তির জাহাজ তথা আমার আহলে বাইতকে রেখে গেলাম। আমার আহলে বাইতের সাথে যাদের সম্পর্ক থাকবে তারা মুক্তি পাবে।

আহলে বাইত এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ, হযরত কাতাদাসহ অন্যান্য মুফাসসিরদের মতে আহলে বাইত বলতে 'আলে আবা' (চাদরাবৃত) কে বুঝানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন 'চাদর আবৃত' কারা? তার বর্ণনা অন্য একটি হাদীস শরীফে এসেছে- উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরবেলায় তাঁর হুজরায় প্রবেশ করলেন। ওই সময় তাঁর দেহ মোবারকে কালো নকশা বিশিষ্ট চাদর ছিল। কিছুক্ষণ পর ফাতিমা আসলে নবীজী তাঁকে চাদরের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর আসলেন আলী (রাঃ)। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও চাদরের ভিতর প্রবেশ করালেন। অতঃপর হাসান-হুসাইন উভয়ে আসলে তাঁদেরকেও চাঁদরে আবৃত করে নিলেন। আর পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

অর্থাৎ হে আহলে বাইত নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা চান তোমাদের থেকে অপবিত্র দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। অতঃপর দোয়া করলেন-

اللهم هولاء اهل بيتى وخا صتى فاذهب عنهم الرجس وطهر هم تطهيرا-

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! এরাই আমার আহলে বাইত এবং ঘনিষ্টজন। আপনি এদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন আর এদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করুন। কেউ কেউ বলেন এই দোয়া করার পরই উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

আহলে বাইত এর মুহব্বত নবীজির সুন্নত ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, উল্লিখিত আয়াত নাযিল হবার পর হতে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাতুয যাহরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলতেন- 'আস্সালামু ইয়া আহলাল বাইতি ওয়াইউতাহহিরাকুম তাতহীরা'। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু'র মতে এই আমল সাতদিন পর্যন্ত জারি ছিল।

আহলে বাইত এর প্রতি মহব্বত মুক্তির পথ ঃ

হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহিত অবস্থায় বলতে শুনেছি-

ياايها الناس انى تركت فيكم ماان اخذتهم به لن تضلوا كتاب الله و عترتى اهل بيتى-

অর্থাৎ হে লোকেরা ! আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর তথা আহলে বাইত। (তিরমিযী শরীফ, মিশকাত শরীফ- ৫৬৫ পৃষ্ঠা।)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিল্লাহু আনহু বলেন-

والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل من قرابتى-

অর্থাৎ ওই সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ, আমার নিকট আমার আত্মীয় অপেক্ষা নবী-ই আকরামের আত্মীয় অধিক প্রিয়। (বুখারী শরীফ)

এভাবে আরো বহু রাওয়ায়াত আছে। যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর ফারুকে আযম রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর অন্তরে আহলে বাইতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। এভাবে অন্য সাহাবীগণও আহলে বাইত এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

একদা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর চাদরের আচল দ্বারা ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু'র চরনযুগল হতে ধুলাবালি মুছে পরিস্কার করে দিচ্ছেন, এতে একটু বিচলিত হয়ে হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন ওহে আবূ হুরায়রা আপনি একি করছেন ? হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, হে সাহেবজাদা ! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পদমর্যাদা সম্পর্কে আমি যা জানি লোকেরা যদি তা জানত তাহলে তারা আপনাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরাফেরা করত।

এভাবে নবী বংশের সদস্যদের মর্যাদা যুগে যুগে মহামনিষীদের নিকট স্বীকৃত ছিল। বড় বড় মুহাদ্দিস, ফোকাহা,মুফাসসির,কবি-সাহিত্যিক আর

ইতিহাসবিদগণ তাদের ক্ষুরধার কলমের আঁচড়ে তার নমুনা উপস্থাপন করেছেন স্ব-স্ব গ্রন্থে।

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেক যখন হজ্বে গমন করলেন, তখন তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেও ব্যার্থ হচ্ছিলেন মানুষের প্রচন্ড ভিড়ের কারণে। মনে মনে কিছুটা ক্ষোভ আর অভিমানে অপেক্ষার প্রহর গুণছিলেন। আর তার সাথে ছিল সিরিয়ার একদল মানুষ। এমন সময় আওলাদে রাসূল ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাওয়াফ এর জন্য যেই মাত্র হাজরে আসওয়াদের দিকে আসলেন তাওয়াফকারী মানুষেরা আপনা আপনিতে জায়গা খালি করে দিলেন আর তিনি সহজেই হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দিলেন। এ অবস্থা দেখে জনৈক সিরিয়াবাসী বলল, তিনি কে? যাকে মানুষ এত সম্মান করছে, অথচ খলিফার প্রতি একটুকু কেউ শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে না? খলিফা চেনার পরও বললেন, আমি তাকে চিনি না। তখন ঐ জায়গায় আরবের একজন প্রসিদ্ধ কবি ফরযদক হাজির ছিলেন। তিনি অনেকটা প্রতিবাদী কণ্ঠে কাব্যকারে বলে ওঠলেন-

هذا الذى تعرفه البطحاء وطاته

والبيت يعرفه والحل والحرم-

অর্থাৎ তিনিতো ওই ব্যক্তিত্ব, যাকে মক্কার উপত্যকা এবং তার ধুলাবালি চিনে, বাইতুল্লাহর হিল্ল এবং হেরেম শরীফও যাকে চিনে। এরপর আরেকটা পংক্তিতে বলেন, তিনিই ফাতেমাতুয যাহরার পুত্র যদি তুমি না জান তাহলে জেনে নাও তার মাতামহ খাতামুন নবীয়ীন (শেষ নবী)।

পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসা উম্মতের ওপর ওয়াজিব। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে -

قل لااسئلكم عليه اجرا الا المؤدة فى القربى-

অর্থাৎ হে রাসূল ! আপনি বলুন হে মানুষ আমি তোমাদেরকে (পথ প্রদর্শন ও ধর্মপ্রচার)'র বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আমার আত্মীয় (বংশধরদের প্রতি মুহাব্বত ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না।

এই আয়াতে করীমা নাযিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার আত্মীয় কারা, যাদের প্রতি ভালবাসা, সৌহার্দ্য আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে ? নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা হল আলী,ফাতেমা, আর তাদের সন্তানদ্বয়।

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও মুফাসসিরগণ যদি আওলাদে রাসূলকে এভাবে সম্মান করেন তাহলে আমাদের কী করা উচিত তা ভেবে দেখা দরকার। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে আওলাদে রাসূলের সাথে সম্পর্ক রেখে জাগতিক ও পরলৌকিক মুক্তি অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমিন!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪

ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

মুহররম মাসে করণীয় ও শিক্ষণীয়

- মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী

চান্দ্র বর্ষের প্রথম মাস মুহররম। এর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব অনেক। দুনিয়ার সৃষ্টি,আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টি, অনেক নবী- রাসূল আলাইহিমুস সালাম এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপুঞ্জ, হিজরি সনের সূচনা, কিয়ামত হওয়া, সর্বোপরি শাহাদাতে কারবালার মত ঐতিহাসিক ঘটনার বাহক এ পবিত্র মুহাররম মাস। একে ঘিরে মুসলামনদের মধ্যে রয়েছে ভিন্নিমত, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। কেউ এ মাসে কারবালার শহীদানের শাহাদাতে শোকমিছিলের আনুষ্ঠানিকতায় আগ্রহী। "হায় হোসাইনের" বুকফাটা আওয়াজে আকাশ-বাতাস মুখরিত করতে সচেষ্ট। এ ধরনের নিছক আনুষ্ঠানিকতা ইসলামী শরীয়তে বৈধতা না থাকলেও এটা প্রচার মাধ্যমে বেশ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আর কেউ এ মাসে কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠানের ঘোর বিরোধী। এরা ভুলক্রমেও এ মাসে শোহাদা-এ কারবালার কোরবাণী ও ত্যাগের কথা মুখে উচ্চারণও করেন না। এদের আলাপ-আলোচনা, মজলিস মাহফিলে শোহাদায়ে কারবালা সম্পর্কে কোন বিষয় স্থান পায় না। মুলত: মুহররম মাসে আহলে বায়তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুন্নী মুসলমানরাই। এ উপলক্ষে আলোচনা মাহফিল ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। এতে কুরআন- সুন্নাহর আলোকে আহলে বায়তের মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব ও ইসলামের জন্য তাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের উপর আলোকপাত করে তাদের অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এসব কার্যক্রমকে বিদআত, ইসলামে নবআবিস্কার ইত্যাদি বলে মুসলমানদেরকে পুন্যার্জন থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা চালানো হয়। এ ধরনের ঘৃণ্য তৎপরতা চালায় ওহাবী নামধারীরা। আরেকটি মহল এ উপলক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার আয়োজন করলেও সেখানে শোহাদায়ে কারবালার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও ত্যাগের আলোচনার তুলনায় কৌশলে ইয়াযিদকে রক্ষার অপচেষ্টা বেশী চালায়। এটা মওদুদীপন্থীদের চরিত্র। এ অবস্থায় পবিত্র মুহররম মাসে মুসলামানদের করণীয়, অনুসরণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়াবলীর উপর দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা প্রয়োজন।

মুহররম মাস ও হিজরি সন ঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ হিসেবে ইসলামে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সফল ও পরিপূর্ণ সমাধান বিদ্যমান। প্রয়োজন শুধু অনুশীলনের। জীবনের সর্বত্র ইসলামী দিকনির্দেশনানুসারেই জীবন যাপনের প্রতি একান্ত আগ্রহের অভাবে মুসলমানদের সর্বত্র পতন ডেকে এনেছে। মানবজীবনে সময় নির্ধারণীর জন্য তারিখের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, ফলে মানব সৃষ্টির পর থেকে মানুষ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে সময়ের হিসাব নির্ধারণ করে আসছে। যেমন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর সময়ে হওয়া "তুফান"কে কেন্দ্র করেই মনে হয় সর্বপ্রথম তারিখ নির্ধারনের সূচনা হয়। বলা হত তুফানের এতদিন পূর্বে বা এতদিন পরে। যেমন বর্তমানে বলা হয় খ্রিষ্টপূর্বে এত বৎসর পূর্বে। এভাবে বিভিন্ন সময় নানা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারিখের সূচনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্মের তারিখকে কেন্দ্র করে খ্রিষ্টাব্দ এর সূচনা হয়েছে। যা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ তারিখ অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু আমার জানামতে আরববিশ্বে সরকারী অফিস-আদালতে এখনো হিজরি সন এর গুরুত্ব সর্বাধিক। এর স্বকীয়তা রক্ষায় তাদের প্রশংসনীয় দিক। অপরদিকে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ এ স্বকীয়তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সে সব দেশের মুসলমানগণ হিজরি সন অর্থাৎ চান্দ্র বর্ষের হিসেবে এর ক্ষেত্রে চরম উদাসীন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ- হে প্রিয় রসূল আপনার নিকট চন্দ্র সম্পর্কে লোকজন জিজ্ঞাসা করবে। আপনি বলুন এগুলো হচ্ছে মানুষের সময় নির্ধারনির মাধ্যম।

আলোচ্য আয়াতে চাঁদকেই হিসেবের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, চন্দ্রের উদয় অস্ত ও দৃশ্যত আকারের ছোট থেকে বড় হওয়ার বিষয়টি হিসাব নির্ধারণির ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক। অপরদিকে সূর্যকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। কারণ, সূর্যে দৃশ্যতঃও হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, যা চন্দ্রে আছে। হিসেবের ক্ষেত্রে এটা একান্তই যৌক্তিক ও সুবিধাজনক যে, ওটা দেখেই অভিজ্ঞজন অনেক সময় তারিখ নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। এসব সৃষ্টিগত কৌশলকে সামনে রেখেই আমীরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ফারুক আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চন্দ্রমাসের ভিত্তিতে হিজরি সনের প্রবর্তন করেন। এরই মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাত পৃথক একটি সন লাভ করেছে। আর এ সনকে হিজরি সন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এতে প্রশ্ন আসে হিজরততো মুহররম মাসে হয়নি, অথচ হিজরি সনের প্রথম মাস মুহররম। ঐতিহাসিকগণ এর উত্তরে বলেছেন- যেহেতু হিজরতের প্রস্তুতি মুহররম মাস থেকে শুরু হয়েছে, তাই হিজরি সন মুহররম মাস থেকে গননা করা হয়েছে।

১০ মুহররম ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

সহীহ হাদীসের আলোকে বর্ণিত, যখন হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনা শরীফ আগমন করলেন, তখন ইয়াহুদীদেরকে ১০ মুহররম রোযা পালন করতে দেখে জানতে চাইলেন এ দিন তোমরা কেন রোযা পালন করছ। তারা বলল এটি একটি বরকতময় দিন। করণ, এদিন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে নাজাত দিয়েছেন এবং ফেরআউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন। তখন হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এর উপর কৃত অনুগ্রহের শোকরিয়ার বেলায় আমরা তোমাদের চেয়ে বেশি হকদার। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও রোযা পালন করলেন এবং মুসলমানদেরকে আশুরা দিবসে রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। (বুখারী শরীফ)

আলোচ্য হাদিস থেকে কতগুলো বিষয় প্রমাণিত হল ঃ

১. কোন নির্দিষ্ট তারিখে নফল ইবাদত করা জায়েয এবং সুন্নাত। আলোচ্য হাদিসে ১০ মুহররমকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

২. বিশেষ কোনদিনে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত নাযিল হলে ঐদিনকে প্রতিবছর স্মরণ ও বরণ করা জায়েয। অতএব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে বড় কোন রহমত ও নে'মত নেই ও হতে পারে না। সুতরাং তার শুভাগমনের তারিখ ১২ রবিউল আওয়াল উদযাপন করা নিঃসন্দেহে জায়েয।

৩. প্রতি বৎসর মুসলমানের মৃত্যু তারিখে ফাতেহা-ঈসালে সাওয়াব বা ওরস উদযাপনের দলীলও এতে বিদ্যমান।

৪. কোনদিন মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হলে দিনটি স্থায়ীভাবে বরকতময় হয়ে যায়। তাই ১০ মুহররমকে হাদিস শরীফে يوم عظيم বলা হয়েছে। মিশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য।

'শবে কুদর' কুরআন নাযিল হওয়ার ফলে স্থায়ীভাবে বরকতময় ও পালনযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে।

৫. শরীয়তে মুহাম্মদীতে নিষিদ্ধ নয়, অন্য শরীয়তের কোন ভাল কাজ করা জায়েয। তবে কিছুটা পার্থক্য করে নেয়া উত্তম। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আমি যদি আগামী বৎসর পর্যন্ত থাকি, তাহলে মুহররমের ৯ম তারিখেও রোযা পালন করব। (মিশকাত শরীফ)

আলোচ্য হাদিসটি মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, কোন দিনে আল্লাহর বান্দার প্রতি বিশেষ কোন রহমত-নে'মাত নাযিল হলে ঐ দিনটিকে নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখা জায়েয। -এ কাজের জন্য এ একটি হাদিসই দলীল হিসেবে যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও ওহাবীগণ কোন নফল মোস্তাহাবের জন্য দিন তারিখ ঠিক করাকে বিদআত বলে অপপ্রচার চালায়। কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর চতুর্থদিন, অপর বেজোড় দিনসমূহে, চল্লিশতম দিবসে, তিনমাস, ছয়মাস, নয়মাস, ও বছর শেষে ফাতেহার জন্য আলোচ্য হাদিসটি দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

আশুরা উপলক্ষে উন্নত খাবার এর আয়োজন ঃ

মুহররমের ১০ তারিখ ঘরে উন্নতমানের খাবার তৈরি করে পরিবার পরিজন নিয়ে খাবার গুরুত্ব ও সুফল হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি আশুরা দিবসে পরিবার পরিজনের জন্য উন্নতমানের যথেষ্ট খাবার এর আয়োজন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সারা বছর স্বচ্ছলতার সাথে চালাবেন। হযরত সুফিয়ান

রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন আমি আলোচ্য হাদিসের আলোকে আমল করে দেখেছি, আর তা পরীক্ষিত সত্য। (মিশকাত শরীফ)

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন আলোচ্য হাদিসটি ছাড়া আশুরার সংশ্লিষ্ট ঘটনাপুঞ্জ সম্বলিত বর্ণনাগুলোর বেলায় আপত্তি রয়েছে।

আলোচ্য হাদিসের আলোকেই মুসলমানগন আশুরা দিবসে উন্নতমানের খাবার তৈরি করে পরিবার-পরিজন নিয়ে খায় এবং গরী-মিসকিনকেও খাওয়ায়। এটা কোন ভিত্তিহীন কাজ নয়; বরং হাদিসে বর্ণিত নির্দেশনার অনুসরণ। সাথে সাথে সৌভাগ্যক্রমে উক্ত দিবসটি শাহাদাতে কারবালার তারিখ হয়ে যাওয়ায় ঐ দিন শোহাদায়ে কারবালার ফাতেহা ঈসালে সাওয়াবও হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানগণ শোহাদায়ে কারবালার মর্মান্তিক ও চরম নিষ্ঠুরতার বিপক্ষে কার্যতঃ অবস্থান নিয়ে উন্নতমানের শরবত তৈরি করে মানুষকে পান করিয়ে শোহাদায়ে কারবালার পবিত্র আত্মাসমূহে সাওয়াব রসানী করে এটিও এক ভাল কাজ নিঃসন্দেহে।

কারবালার শিক্ষাসমূহঃ

শোহাদায়ে কারবালার স্মরনের পাশাপাশি আজ সবচেয়ে প্রয়োজন হলো তাদের যথার্থ অনুসরণ করা। কারবালার মর্মান্তিক ইতিহাসে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে।

এক. দেশ ও জাতির সার্বিক দূরাবস্থার সময় নীরব দর্শকের ভূমিকায় না গিয়ে সাধ্যমত অবস্থার পরিবর্তনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সেদিন সৈয়্যদুনা ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখেছেন যে, ইয়াযীদের হাতে ইসলাম ও রাষ্ট্র কোনটিই নিরাপদ নয়। তাই তিনি এর কোন কিছুর অভাব থাকত না। কিন্তু তিনি ঐসব বৈষয়িক সুখ-শান্তিকে পদদলিত করে ইসলাম ও রাষ্ট্র রক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সম্মনিত পীর-মাশায়েখ এ বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

দুই. অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান গ্রহন করা। ইয়াযিদের পক্ষ থেকে দেয়া সকল প্রলোভনকে পায়ের নিচে দিয়ে শাহাদাত বরণ করে স্থায়ীভাবে ধন্য হয়েছেন। তারপর অভিশপ্ত ইয়াযিদের হাতে হাত দেননি, হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি যথার্থই বলেছেন-

"হযরত ইমাম হোসাইন শির দিয়েছেন, তারপরও ইয়াযিদের হাতে হাত দেননি।" নিশ্চয়ই ইসলামের মূলমন্ত্রের ভিত্তি হলেন সৈয়্যাদুনা ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

তিন. হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে এ ঘৃণা রক্তপাত এড়িয়ে চলার চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু পার্থিব স্বার্থে অন্ধ ইয়াযিদ পক্ষ তার কোন প্রস্তাবে রাজি হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত নবী পরিবারের উপর ইতিহাসে নযিরবিহীন নির্যাতন চালিয়ে একচরম কলংকিত অধ্যায়ের সূচনা করল। আজ মুসলিম নেতৃবৃন্দের উচিত রক্তপাতের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে নিজদের অস্তিত্ব টিকেয়ে রাখার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা।

চার. সৎ ভাইসূলভ আচরণের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুফার সফরে হযরত ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাথে তার সৎভাইগণও ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি চূড়ান্ত বিপদ দেখে সৎভাইগণও অন্যান্য সফরসঙ্গিদেরকে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের একজনও নবী দৌহিত্রকে ছেড়ে যাননি। বরং তারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইমামের পক্ষে লড়ে শাহাদাত বরণ করেন।

পাঁচ. নারীদের পর্দার প্রতি ইমামের জোর তাগিদ। শেষবারের মত তাবু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রীগণ ও অন্যান্য মহিলাদেরকে পর্দার প্রতি যত্নবান থাকার উপদেশ দিয়ে বলেছেন তোমাদের চোখের সামনে আমাকে জবেহ করলেও তোমাদের কান্নার শব্দ যেন আমি না শুনি।

ছয়. নামাযের প্রতি অসামান্য গুরুত্ব। কারবালায় ইয়াযিদবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হাবার পর শাহাদাত লাভের চূড়ান্ত সময় যখন ঘনিয়ে আসল তিনি নামাযের নিয়ত করলেন। প্রথম রাকাতের প্রথম সেজদায় তাকে শহীদ করা হয়। দ্বিতীয় সেজদার সুযোগ দেয়নি। অতএব হুসাইনী মুসলামানদেরকে নামাযের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)-এর কবিতায় হযরত ইমাম হুছাইন (রাঃ)

- ওবাইদুল মোস্তফা মুহাম্মদ হাসান

"শাহ আস্ত হোছাইন, বাদশাহ আস্ত হোছাইন,
দ্বীন আস্ত হোছাইন, দ্বীন পানাহ আস্ত হোছাইন,
ছরদা-দ না দা-দ দস্ত- দর দস্তে ইয়াযিদ
হক্কা-কে বেনায়ে লা-ইলাহ আস্ত হোছাইন"।

উপরোক্ত বিখ্যাত পংক্তিগুলো হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মুঈন উদ্দীন চিশতী (রঃ) এর রচিত বলে জানা যায়। এ লাইনগুলো শুধু কবিতা হিসাবে অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন নয়, এর প্রত্যেকটি লাইনে রয়েছে এক অলৌকিকত্ব এবং ইতিহাস ও আক্বীদা সম্পর্কিত অসংখ্য কিতাব যেন এতে একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। একইভাবে এ চার লাইনের পদ্য বহু শতাব্দী যাবৎ যেভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার নজীর নেই।

বর্তমানে যদিও ফার্সী ভাষার প্রচলন সাধারণের মধ্যে নেই বললেই চলে,তথাপি এমন মুসলিম পরিবার খুবই কম আছে যেখানে এ চতুর্পদী পাঠ করা হয় না অথবা শুনা যায় না। প্রতি বৎসর যে ইসলামী ক্যালেন্ডার ছাপা হয়ে থাকে তার মধ্যে বেশীর ভাগ ক্যালেন্ডারেই এ কবিতা মুদ্রিত হয়ে থাকে।

অধিকাংশ ইসলামী ওয়াজ মাহফিলে অথবা আলোচনা সভায় এ পদ্যাংশ বক্তারা উল্লেখ করেন যে, এক জন মুসলমান নিজ শির দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু অসত্য এবং অত্যাচারের কাছে স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিতে পারেন না যদি তিনি প্রকৃত মুসলমান হন।

চার লাইনের এ কবিতার প্রথম লাইনে 'শাহ' এবং 'বাদশাহ' দু'টি একই অর্থবোধক অথবা পরিবর্তনযোগ্য শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি অথবা শব্দালংকার সম্পূর্ণ করতে বাধ্যতামূলকভাবে একার্থবোধক হলেও প্রচলিত 'শাহ' তাকে বলা হয়; যিনি ধর্ম এবং মাজহাবের আদেশদাতা এবং 'বাদশাহ' তাকে বলা হয় যিনি দুনিয়া সম্পর্কিত রাজত্বের সিংহাসনের অধিষ্ঠিত এবং উপকার প্রাপ্ত। এজন্য পদ্যেও প্রথম ছত্রেই ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে দ্বীন এবং দুনিয়া দু'য়েরই বাদশাহ বলে মানা হয়েছে এবং ইয়াজীদকে সাংসারিক রাজত্বেরই বাদশা মানতে পরিস্কার ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। দ্বিতীয় লাইনে একথা যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা হয়েছে যে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর ব্যাক্তিত্বে ধর্মীয় গুণাবলীর সমষ্টি বিদ্যমান ছিল। তার প্রত্যেকটি বার্তা ছিল ইসলাম ধর্মীয় প্রত্যেকটি কাজ ছিল ইসলামী।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- "হুসাইন এর মাংস আমার মাংস, হুসাইন এর রক্ত আমার রক্ত"। এ কথা মেনে নিতে হবে যে, ইমাম হুসাইন (রাঃ) দ্বীন, দুনিয়া দু'য়েরই বাদশা ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন যে, ধর্মের ব্যাপারে রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থানে কুদরতীভাবে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাবেন। কুদরতীভাবে রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর এক সময় পরিণাম এমন আসবে যখন ইমাম হুসাইন (রাঃ) ধর্মের আশ্রয় "দ্বীন পানাহ" হিসেবে থাকবেন। ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর সাহায্যে ঐ সময় ঈমান নিরাপদ ছিল। তাঁর দেখা শুনায় এবং আয়োজনে ইসলাম সংরক্ষিত (মাহফুজ) ছিল। পদ্যের তৃতীয় ছত্রে কারবালার অনেক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা রয়েছে। অর্থাৎ ইয়াজীদ ইমাম হুসাইন হতে নিজ রাজত্বের স্বীকৃতি লাভের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে এবং ইমাম হুসাইন (রাঃ) ক্বোরআন হাদীস সমর্থিত ইসলামী রাজত্বের চিন্তা ধারার অনুসারী ছিলেন বিধায় ইয়াজীদকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন এবং অস্বীকৃতির উপর তিনি এমন ভাবে অটল থাকলেন যে শেষ পর্যন্ত স্বীয় ছের মোবারক দ্বিখন্ডিত হলো তথাপি ইয়াজিদকে ইসলামী হুকুমতের বাদশা মেনে নিলেন না।

কারণটি দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল যে, তিনি ইসলামী কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আদর্শের এবং পরকালের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য যে জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইয়াজিদ এর গোটা চিন্তাধারা ছিল এর বিরুদ্ধে এবং সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকৃতি মূলক। হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) আল্লাহর মনোনিত ধর্মকে ঐ ধাচে এবং ভাবধারায়

বহাল এবং সংরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন এ দিক থেকে ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে "দ্বীনে পানাহ" ধর্মের আশ্রয় বলা সব দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত নয় কি ?

চতুর্থ ছত্রটি ঐতিহাসিক প্রভাব ও পরিণাম সমূহকে প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াজিদ-এর রাজত্বকালীন সময়ে ইসলাম-এর ইমারত প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল যা "লা ইলাহার" ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইমাম আলী মাকাম (রাঃ) সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এমন কি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন প্রিয় বন্ধু-বান্ধব ও শিশু পুত্র আলী আছগরের শাহাদতের বিনিময়ে ইসলামের পতনোন্মুখ অট্টালিকার ভিতরে নতুন ভাবে আস্তরণ করলেন এবং লা ইলাহা'র নতুন আঙ্গিকে ইসলামের ইমারত তৈরী করলেন। আবার সমষ্টিগতভাবে এ চতুর্পদী হতে মুসলমানদের জাতীয় পথ, নিয়ম-কানুন এবং আদর্শ প্রকাশিত এবং আমলের ধারাও চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যখনই ইসলামের রজ্জু, মূলনীতি ও আদর্শের উপর কোন অত্যাচারী শাসকের কারণে আঘাত আসে তখন সত্যিকারের কোন মুসলমান নিজের জান কোরবানী থেকে বিরত থাকতে পারে না। এ কবিতার কথায় যে সৌন্দর্য রয়েছে তা এ কাজেরই বাস্তব সাক্ষ্য যে-এ পদ্য হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাঃ) এর রচিত হতে পারে, অন্য কারো রচনা হতে পারে না। কোন কোন বংশের প্রকাশ হওয়ার ঘটনাবলীর প্রভাব কুদরতী ভাবে হয়ে থাকে।

এ লাইন গুলোতে শোকের স্থানে আত্মার স্থিরতা বিদ্যমান যা সহজেই বোধগম্য। সবাই জানেন যে, হযরত ইমাম হুছাইন (রাঃ) এর বংশ কারবালার ময়দানে প্রায় শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু মাত্র হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) অসুস্থতার কারণে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু শাম ও কুফার সৈন্য বাহিনী তাকে বন্দী করেছিল। সৈয়দ বংশের রক্তধারা হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) থেকে চলে আসছে এবং হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর বংশধারা পৃথিবীতে বাকী রয়েছে। সৈয়দ বংশীয় রক্তধারার সমুদ্রের বহু মূল্যবান সম্পদের মধ্যে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাঃ) এক অমূল্য সম্পদ। এ বংশধারা জনিত সম্পর্কও এ কাজের প্রমাণ দেয় যে, এ 'রুবাঈ' চতুর্পদী হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ) এরই চিন্তা ও চেতনার আবশ্যম্ভাবী ফল হতে পারে। অন্য কোন কবি অথবা সাধারণ চিন্তাশীল কোন কবির চিন্তা প্রসূত সৃষ্টি হতে পারেনা। এ প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে এ (রুবাঈ) চতুর্পদীতে কবিত্বেও যে অদৃশ্য শক্তি এবং অলৌকিকত্ব আছে তার প্রমাণ হল এই যে, চার সংক্ষিপ্ত ছত্রের মধ্যে ঐ সব কিছু বলে দেয়া হয়েছে যার বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হলে একটি বই এর প্রয়োজন হবে। এ চার লাইনের কবিতা সর্বজনের অন্তরে সাদরে গৃহীত হওয়ার এটা প্রকৃষ্ট বুনিয়াদী কারণ।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পথে

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগদিন

বাংলাদেশ যুবসেনা
BANGLADESH JUBOSENA

-: যোগাযোগ :-
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ, ০১৯১১৯৬৪২৮৬
মোহাম্মদ আজিম চৌধুরী, ০১৬১৬৫৫৫৬৬৪

হিজরি সন ঃ চেতনার ফল্গুধারা

- মোহাম্মদ আবু তালেব বেলাল

হিজরি সন মানে ত্যাগের এক মহান স্মারক। এ ত্যাগ মহান রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা বাস্তবায়নে মানবতার মুক্তিদূত মহনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে ইসলামের শাশ্বত বাণী বিশ্বময় প্রচার ও প্রকাশের। কালের আবর্তে শত দুঃখ কষ্ট, শান্তি আর অশান্তির আঁটি নিয়ে আমাদের থেকে বিদায় নিল ১৪৩৭ হিজরি সাল। অন্যদিকে নবদিগন্তে উদিত সূর্যের ন্যায় সুখ আর সমৃদ্ধির আলোকবর্তিকার এক বুকভরা প্রত্যাশা নিয়ে আবির্ভূত হল ১৪৩৮ হিজরি সাল। হিজরি সনকে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন পৃথিবীর চেতনার ফল্গুধারা হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম (যীশু খ্রীষ্ট) এর জন্ম মাস থেকে খ্রীষ্টীয় বা ঈসায়ি সন গণনা হয়নি বটে। তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের তাৎপর্যময় ঘটনার অবিস্মরণীয় ক্ষণটি হিজরি সনের স্মারক হয়ে আছে। এ সন ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিক দ্বীন প্রতিষ্ঠায় এক মহান মাইলফলক হিসেবে এখনো অবিস্মরণীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃভূমি ত্যাগের মতো এ ক্ষণজন্ম সময়টি গোটা পৃথিবীর মানবজাতির আধ্যাত্মিক মননে এক নতুন জাগরনের সৃষ্টি করেছিলেন। ঐতিহাসিক পি.কে. হিট্টির ভাষায়-

এই হিজরতের মাস একদিকে রাসূলে করিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মভূমি আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করার মতো দুঃখ ও বেদনার স্মারক হয়ে আছে অন্যদিকে তাঁর মহান আওলাদে পাক আহলে বাইতে রাসূল এর মহান আত্মত্যাগের (শোহাদায়ে কারবালার) এক মহান স্মৃতি স্মারক হয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি মানবতার অন্তরে ঠাঁই নিয়েছে। তাই অন্যান্য যে কোন নববর্ষ আয়োজনে যমকালো উৎসবের আমেজ থাকলেও হিজরি সন উদযাপনে এ ধরনের আড়ম্বপূর্ণ কোন উৎসবের আয়োজন থাকে না। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুর মু'মেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খিলাফতকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিঃ) এ হিজরি সনের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে হযরত ওমর দুটি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন-

১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসা।

২. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা।

ইসলামের মহান বাণী এবং মুসলিম সাম্রাজ্য আরবের সীমা পেরিয়ে রোম ও পারস্য পর্যন্ত সম্প্রসারণের ফলে বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহে প্রশাসক, কাজী বা বিচারক ও সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করে সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনার জন্য বিভিন্ন চিঠিপত্র প্রেরণ করতেন। কিন্তু তাতে সুনির্দিষ্ট সন তারিখ না থাকায় সংশ্লিষ্টরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। এ ধরণের এক সমস্যায় পতিত হয়ে তৎকালিন কুফার গভর্ণর হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু খলিফা হযরত ওমর ফারুকের খেদমতে এ মর্মে আবেদন করলেন যে, আমিরুল মু'মিনীন! আপনার পক্ষ থেকে আপনার পরামর্শ ও নির্দেশ সম্বলিত যেসব চিঠিপত্র আমরা পেয়ে থাকি তাতে কোন তারিখ উল্লেখ না থাকায় এতে আমাদের সময় ও কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয়। ফলে কখনো ঐসব নির্দেশ যথাযথ পালন করতে গিয়ে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন হই। পূর্বাপরের নির্দেশনাবলীর সাথে পার্থক্য নির্ণয়ে আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এভাবে আরও বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকগণ বেশ কয়েকটি আবেদন পেয়ে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশিষ্ট সাহাবীদের

নিয়ে মজলিস এ খাস এর এক জরুরী সভার আহবান করেন। সভায় উপস্থিত বিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরাম এ মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, একটি ইসলামি স্মারকসম্বলিত পঞ্জিকা প্রবর্তনের অতীব প্রয়োজন। কোন মাস থেকে এর সূচনা হবে এ নিয়ে মজলিসের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য দেখা যায়। কারণ, তাৎকালীন প্রচলিত সন যেহেতু খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের উদ্ভাবিত হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর পবিত্র জন্মের স্মৃতি স্মারক সন এবং এটি খ্রিষ্টানের জন্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে সংরক্ষণ করছে। তাই মুসলমানদের উচিত ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি স্মৃতি স্মারক হিসাবে গ্রহণ করে ইসলামী সন প্রবর্তন। ফলে হযরত ওমরের আহবানকৃত ওই মজলিমে খাস এ কেউ কেউ খ্রিষ্টীয় সনের ন্যায় মহানবীর শুভাগমনের মাস রবিউল আউয়াল থেকে ইসলামী সনের তারিখ প্রবর্তনের প্রস্তাবনা পেশ করেন। কিন্তু হযরত ওমর এ প্রস্তাবনার দ্বিমত পোষণ করেন এবং তিনি স্পষ্টত ঘোষণা করেন নবীজির শুভাগমন বা নবুয়্যাতের প্রকাশের মাস থেকে ইসলামী সন গণনা করা যাবে না। উল্লেখ্য, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নবুয়্যত প্রকাশের পর মুসলমানরা সন বা তারিখ গণনার সময় নবুয়্যতের পূর্বে ও পরে শব্দগুলো ব্যবহার করত। তাই মজলিশের অনেকেই নবুয়্যত প্রকাশের পর থেকেও সন গণনার প্রস্তাব করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু হযরত ওমর ২টি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কারণ খ্রিষ্টান সম্প্রদায় যেহেতু হযরত ঈসা আলাইহি সাল্লাম-এর জন্ম মাস থেকে খ্রিষ্টাব্দ সনটি গণনা করে সেহেতু তাদের সাদৃশ্য বা অনুরূপ সন গণনা ইসলামী বৈশিষ্ট্য বিরোধী। সুতরাং সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয় যে, ইসলামের গুরুত্বর্ণ ও তাৎপর্যময় এমন একটি ঘটনা দিবসকে কেন্দ্র করে হিজরি সন গণনা হবে যা ইসলামী ইতিহাসকে সাফল্য ও সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। এসব বিবেচনায় মজলিশে উপস্থিত সকল সদস্য ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ ও সাফল্যের এক সেতুবন্ধনকারী এই হিজরতই হযরত ওমর ও সাহাব-ই কেরামের বিবেচনায় হিজরি সনের সূচনা হয়। আর হিযরতের প্রারম্ভিক নির্দেশ যেহেতু মুহররম মাসে হয়েছিল,তাই মুহররমকেই হিজরি সনের প্রথম মাস হিসেবেই নির্ধারণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। এভাবে সূচনা হয় হিজরী সনের। হিজরতকে কেন্দ্র করে ইসলামী বর্ষপঞ্জির সূচনা করার মধ্য দিয়ে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও সাহাবায়ে কেরামের দূরদর্শিতার পরিচয় মিলে। কারণ, ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনে 'হিজরত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হিজরতের মধ্যে দিয়ে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার উন্নতি ও অগ্রগতির সূচনা হয়। হিজরতের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসী মুহাজির ও মদীনাবাসী আনসারদের নিয়ে মদীনায় একটি স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়। তাই হিযরত ছিল ইসলামের মহান আবেদনের পূর্ণতার সূত্রপাত ও মহান রাব্বুল আলামীনের মনোনীত দ্বীন আল ইসলামের প্রচার-প্রসার ও পৃথিবীর মানবতার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার এক সুবর্ণ উপলক্ষ। তাই হিযরতের ঘটনা দিয়ে ইসলামী বর্ষপঞ্জির সূত্রপাত এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার রাসূলে রহমত' পুস্তকে লিখেন তখনকার জাতি গোষ্ঠির ইতিহাস ও সন তারিখ পর্যালোচনার পর সাহাবায়ে কেরামগণের সামনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ও নবুয়্যত প্রকাশের দিনগুলোকে সাল নির্ধরিণে বেশি উজ্জ্বল মনে হলেও জন্ম ও ওফাত দিবসের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে পরবর্তীদের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এমন আশংকার দরুন তারা রাসূলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোন ঘটনা অন্বেষণ করেছিলেন। ফলে হিজরতের ঘটনাই সকলের নিকট বেশি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যা ছিল সকল সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যজাতির বিজয় ও সফলতার কীর্তি নিয়ে তাদের ইতিহাস ও সন তারিখ নির্ধারণ করে। কিন্তু

ইসলামের অনুসারীগণ রাসূলে করিম ও সাহাবায়ে কেরামদের মজলুম অসহায় ও সর্বহারা দেশ ত্যাগের প্রতীক হিসেবে হিজরী সনকে দিয়ে সূচনা করেছিলেন মিল্লাতের ইতিহাস। জগতের মানুষ বীরত্বগাথার কীর্তিগুলো জাগ্রত রাখে। আর সাহাবীগণ করুণ চিত্রগুলো জীবন্ত করে রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি চায় তাঁদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্ম বা বিজয় দিয়ে তাদের ইতিহাস রচিত হউক। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নিলেন শ্রেষ্ঠ কর্ম দিয়েই তাদের ইতিহাস সূচনা হবে। যুদ্ধের ময়দানে শুধু বিজয় নয়, কঠিন নির্যাতন, নিপীড়ন বিশাল শক্তির মোকাবেলার ধৈর্য, তা দৃঢ়তার বিজয় দিয়ে আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হবে। অন্যান্য জাতির বিশ্বাস, রাষ্ট্র ও ক্ষমতার প্রসার দ্বারা নিজেদের শক্তির ভিত রচিত হবে।

পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাস ছিল ভিন্ন দেশ পদানত নয়, স্বদেশ মাতৃভূমি ত্যাগ করার দিন থেকে তাদের শক্তি,খ্যাতি ও ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ'র অনুসারীদের এ উপলব্ধি অন্য সব জাতির অনুসকরণ থেকে ব্যতিক্রম দূরদর্শিতার পরিচায়ক এবং নিজস্ব সমাজ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃষ্টিশৈলীর বহিঃপ্রকাশ। অতএব, হিজরি সন ও তারিখ গণনার মাধ্যমে আমরা যেমন ইসলামের ইতিহাসকে জীবন্তভাবে প্রত্যক্ষ করি তেমনি প্রত্যক্ষ করি ইসলামের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার এবং বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের একটি সহাবস্থানের। সুতরাং এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি অন্যান্য বর্ষের চেয়ে হিজরি সন স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্টের দাবিদার। মুসলমান হিসেবে হিজরি সনের প্রতি আমাদের উপেক্ষা বা খেয়ালীপনা কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করছি অন্যান্য নববর্ষগুলো নানা আয়োজনে পালন করে থাকলেও হিজরী নববর্ষ রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন তো দূরের কথা সামাজিক ভাবেও করা হয় না। অথচ হিজরি সন আমাদের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজকের গৌরবমাখা বাংলা সনের পূর্বসূরি হিসাব ইতিহাসে এখনো ঠাঁই করে আছে হিজরি সন। সুতরাং হিজরি সনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সনের ইতিহাস রচনা এবং পরিপূর্ণতা লাভ কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই আমাদের সকলের উচিত হিজরি সনকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যময় সন হিসেবে বিবেচনা করে তা যথাযথভাবে মর্যাদা সহকারে পালন করা।

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১৫-২০১৬ ইং সেশনে ভর্তি চলছে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজ

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৫ বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।
[২০১৫ইং সালের পাশের হার ৯৮%]"

ভর্তি চলছে

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল,ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

সূফী তত্ত্ব ও সূফী সাধনায় ফানা ও বাকা

- ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

সূফীতত্ত্ব তাসাউফের বাংলা রূপ। আরবী শব্দ তাসাউফ সাওফ থেকে নির্গত। এর অর্থ পশম। আর সূফী মানে যে পশমী কাপড় পরিধান করেন। সূফীগণ মোটা পশমী কাপড় পরিধান করতেন বলে তাদের সূফী বলা হয়। সূফীবাদ বা তাসাউফের ইতিহাস ইসলাম ধর্মের মতই পুরাতন। ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই সূফীবাদের বিকাশ ঘটে। তাসাউফ ইসলামের রূহ বা আত্মা। আর শরীয়ত হল এর দেহ বিশেষ। সকল নবী রাসূল স্বীয় আত্মাকে পরিশোধিত করার জন্য একনিষ্ঠ ছিলেন।

তাঁরা ধ্যান মগ্ন থাকতে পছন্দ করতেন। এ কারণে বলা যায়, সূফী সাধকের তত্ত্বের সূচনা আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে সূচিত হয়েছে। অবশ্য সূফী নাম হিজরী দ্বিতীয় শতকের পূর্বে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচিত না হলেও সূফী চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের পরিচয় এর বহুপূর্বেই পাওয়া যায়।

আল্লামা কুশাইরী তাঁর আর-রিসালাহ গ্রন্থে বলেন- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ছিলেন প্রথম সূফী এবং তাঁর সাহাবীরা ও তাবেঈগণ ছিলেন এ তত্ত্বের অনুসারী। তবে তাঁরা সূফী অভিধা গ্রহণ না করে সাহাবী ও তাবেঈ উপাধি বেশি উপভোগ করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী হাজভেরী তাঁর কাশফুল মাহজুব গ্রন্থে হযরত আবুল হাসান থেকে বর্ণনা করেন- বর্তমানে তাসাউফ সারতত্ত্ববিহীন একটি নাম সবর্স্ব বিষয়। কিন্তু বিগত দিনে এটি ছিল পরিচয় বিহীন একটি বাস্তব বিষয়। আল্লামা হাজভেরী আরও বলেন- সাহাবী ও তাবেঈদের যুগে এ নামের অস্তিত্ব ছিল না অথচ এর সারতত্ত্ব প্রত্যেকের কাছে ছিল দেদীপ্যমান।

হযরত আলী (র.) হতে তিন ধারায় সূফীতত্ত্বের বিকাশ লাভ করেছে।

এক. যারা তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন তাদের মাধ্যমে।

দুই. তাঁর পুত্র ইমাম হাসান ও হোসাইন (র.) এর বংশানুক্রমে।

তিন. তাঁর অন্যান্য পুত্রদের বংশধারায়। ইমাম হোসাইন (র.) এর পুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহ:)এর আটজন পুত্র সন্তান ছিল। বিশেষত তাঁদের মাধ্যমে পরবর্তীতে তাসাউফের বিকাশ লাভ করে।

খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তাসাউফের চরম উন্নতি সাধিত হয়। হযরত ফুদাইল ইবনে আয়ায (রহ.) এর প্রধান খলিফা হযরত মারুফ কারখি (রহ.) (৮০৮খৃ)এবং তাঁর শিষ্য হযরত সিররি সাকতি (রহ.) (৮৫খৃ.) তাসাউফের প্রচারক ছিলেন। এ শতাব্দীতে আল মুহাসিবি (রহ.) (৮৩০খৃ.) প্রথম সূফী তত্ত্বের উপর কিতাব রচনা করেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) তাঁর শিষ্য ছিলেন। এর পর জুন্নুন মিসরি (রহ.) সূফী তত্ত্বের উপর কিতাব রচনা করেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) তাঁর শিষ্য ছিলেন। এরপর জুন্নুন মিসরী (রহ.) সূফী দর্শনকে আরও শাণিত করেন। এসময় কতিপয় সূফী এমন কিছু গুপ্ত রহস্য বর্ণনা করেন যা প্রথমে মুসলিম সামাজকে সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত করেছিল। এদের পুরোধা হলেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) (৮৭৪খৃ.)। তাঁর "হামে উস্ত" তত্ত্বদ্বারা তিনি সর্বেশ্বরবাদের গোড়া পত্তন করেন। তিনিই প্রথম ফানাবাদের প্রবর্তন করেন।

দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রখ্যাত সূফী সাধক জুনায়েদ বোগদাদী (রহ.) (৯১০খৃ) হযরত বায়েজিদের ফানাতত্ত্ব স্বীকার করে তাঁর বাকা তত্ত্ব প্রচার করেন। এসময় তাঁর শিষ্য মানসুর হাল্লাজের (রহ.) "আনাল হক" তত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পেরে জাহেরী আলেমরা তাঁকে কাজির বিচারের কাঠগড়ায় উপস্থিাপিত করেন।

হাল্লাজের(রহ.) যুক্তিটি এরূপ একজন সূফী যখন আল্লাহ্র সাথে একাত্ব হন তখন তার এবং আল্লাহর মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না। আর তা থাকে না বলেই এ একাত্ব অবস্থায় সূফী অভিজ্ঞতার চরম মুহূর্তে সূফী একজন ব্যক্তি হিসেবে তার নিজেকে আল্লাহ বলে হাজির করেন না; বরং আল্লাহই সে সূফীকে তার বহন হিসেবে ব্যবহার করেন। হাল্লাজের এ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনা যায় হযরত জুনাইদ বোগদাদীর (রহ.) কণ্ঠে- তিনি বলেন, ত্রিশ বছরব্যাপী আল্লাহ মানুষের জবানে জুনাইদের ভেতর দিয়ে লোক সমাজে কথা বলেন, আর জুনাইদ তখন কথা বলেননি কিন্তু তা বুঝাতে পারেনি। এরপর সূফী দর্শনের বিকাশ হতে থাকে। কিন্তু খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সূফীদের উপর এক চরম বিপর্যয় নেমে আসে। কেবল শরীয়তপন্থী আলেমরা সূফী দর্শনকে ইসলামের পরিপন্থী

বলে ঘোষণা করে। এ আন্দোলনে তারা তখনকার শাসনগোষ্টিকে দিয়ে সূফীদের উপর চরম অত্যাচার চালান। সূফীদের এমন যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন হুযযাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (১০৫০-১১১১ খৃ.)। তিনি শরিয়তের সাথে সূফী দর্শনের সমন্বয় সাধন করে প্রায় চারশত কিতাব রচনা করেন। তিনি শরিয়ত মারিফাতের বিরোধ নিরসন করে ইসলামী দর্শনের পূর্ণতা সাধন করেন। এরপর শ্রেষ্ঠ তাপস অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সূফী সাধক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (১০৭৭-১১৬৭ খৃ.) রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আবির্ভাব হয়। তিনি কাদেরীয়া তরিকা প্রবর্তন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সূফী দর্শনের পূর্ণতা সাধন করেন জগতবিখ্যাত অলি খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃত.১২৩৫ খৃ.)। এ শতাব্দীতে বিখ্যাত অলি হযরত শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়াদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃত. ১২৩৩ খৃ.)। ভারতে কাদেরীয়া তারীকার শাখা সোহারাওর্য়াদিয়া তরিকার প্রবর্তন করেন। এ শতাব্দীতে স্পেনীয় সূফী দার্শনিক হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃ. ১২৪৩ খৃ.) সূফী দর্শনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্ব বিখ্যাত সূফী সাধক জালালউদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিও (মৃ. ১২৭৩ খৃ.) এ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি মৌলোভিয়া নামে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এরা ধর্ম নৃত্য ও ধর্ম সংগীতের একান্ত ভক্ত। পরবর্তীতে সকল সূফী সাধক উল্লিখিত সূফীদের অনুসরণ করেন।

সূফী দর্শনের লক্ষ্য ও মূলনীতি ঃ

সূফী দর্শনের মূল লক্ষ্যে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে তাঁর দীদার লাভ করা। পরম কিছুই দিতে পারে না। তাই জড়-জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখ ও সম্পদের প্রতি সূফী সাধকের এক বিরাট উদাসীনতা, এক দারুণ অনীহা, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রলোভন ও ইন্দ্রিয়াশক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ মনুষত্ব্যের সাধনায় তারা নিয়োজিত। পার্থিব আসক্তি দূর হলে আধ্যাত্মিক প্রেম এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ইনসান-ই-কামিল (পূর্ণ মানব) হতে হলে সূফিদের কতকগুলো মৌলিক নীতি অনুসরন করে চলতে হয়। তওবা (অনুতাপ), তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা), তাকওয়া (পরিবর্জন), সবর (ধৈর্য্য), ইখলাস (পবিত্রতা), শোকর (কৃতজ্ঞতা), রেজা (আত্মতুষ্টি), যুহদ(বৈরাগ্য,),খওফ (আল্লহ ভীতি), ফকর (দারিদ্র্য), আদব (ভাল ব্যবহার), মহব্বত (আল্লাহ প্রেম), মোরাকেবা (ধ্যান), তাওহীদ (একত্ব), ইলম (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) প্রভৃতি সূফী তরীকার প্রাথমিক নীতি সূফী জীবনে এগুলো প্রতিফলিত না করা পর্যন্ত মারিফাত ও হাকীকাত লাভ হতে পারে না এগুলো লাভ করা বা এই নীতিমালা অনুসরণ করা তরীকত পন্থীদের অবশ্য কর্তব্য।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ৭ টি মূলনীতি সূফী সাধককে অনুসরন করে চলতে হয়- আত্মসমর্পণ,যিকির (স্মরণ), কাশফ (অতিন্দ্রিয় অনুভূতি), সামা(আল্লাহ প্রেমমূলক সঙ্গীত), হাল (ভাব বা অবস্থা), ফানা (আত্মবিলয়) ও বাকা (আল্লাহতে স্থিতি লাভ)।

(ক) আত্মসমর্পন ঃ আল্লাহতে পরিপূর্ণ সমর্পনই ইসলামের মর্মকথা। মুসলিম জীবনের ইহকাল ও পরকালের সবকিছু আল্লাহরই জন্য সমর্পিত। সেজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, (বল), আমার উপসানা আরাধনা, উৎসর্গ অনুষ্ঠান, আমার জীবন-মরণ সমস্তই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহরই জন্য। সূফীরা এই শাশ্বত বাণীর অনুসরণেই আত্মসমর্পনের বিশেষ নীতি মেনে চলেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক পথপরিক্রমার প্রারম্ভেই মুরশিদ বা পীরের নিকট আত্মসমর্পন করেন। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য প্রকাশ ব্যতীত যেমন কোন ছাত্রের শিক্ষা গ্রহন সার্থক হতে পারে না, তেমনি সূফী সাধকের পক্ষেও স্বীয় পীর মুরিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পরিপূর্ণ অনুগত না হওয়া পর্যন্ত মারিফাত অর্জন সম্ভব নয়।এ সময় পীরের নিকট মুরিদ দুভাগে আত্মসমর্পণের ক্রিয়া সমাধা করেন।

প্রথমতঃ নিজের আখলাক ও নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করে পীরের আখলাক ও ইচ্ছাকে গ্রহণ করা। পীর নায়েবে নবী। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামা এর গুনাবলীর নমুনা পীরের কাছেই বর্তমান। তাই তাঁর আখলাক গ্রহণ করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আখলাকই গ্রহণ করার নামান্তর।

দ্বিতীয়তঃ তাসাওরে শায়েখ বা পীরের সুরাত (চেহারা) ধ্যান। এখানে পীরের চেহারা এমনিভাবে ধ্যান করতে হয়,যেন মুরিদের নিজস্ব কোন চেহারাই নেই। তাসাওরে শায়েখকে কোন কোন তরীকায় বরযাখ (আড়াল) বলা হয়।পীরের চেহারা ধ্যান করার সাধনে নূরই মুহাম্মদী লাভ হয়। এবং নূর-ই- মুহাম্মদী ধ্যান করার মধ্য দিয়ে নূর-ই-তাজাল্লী লাভ হয়। এমনিভাবে সাধক পীরের কাছে আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও আত্মসর্মণের শিক্ষা গ্রহণ করেন। সাধারণ

উচ্চমর্গে সূফী নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করে দেন। এভাবে পরিপূর্ণ আত্মসর্মপনের মাধ্যমে সূফী-সাধক আল্লাহ্‌র রহমত ও নিয়ামত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

(খ) যিকির ঃ

আল্লাহ্‌র স্মরণকে যিকির বলে। সাধারণত আল্লাহ্‌র কোন নাম বা কুরআনের কোন আয়াত পুণঃপুণঃ আবৃত্তি করার নাম যিকির। কুরআনে বলা হয়েছে, "ফাযকুরুনী আযকুরকুম" অর্থাৎ তুমি আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাকে স্মরণ করব। অন্যত্র, "হে বিশ্ববাসিগণ ! যত বেশী সম্ভব আল্লাহ্‌র যিকির কর, আর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা কীর্তন কর। কুরআন ও হাদীসের যিকির করার উপর বহু আয়াতে জোর দেয়া হয়েছে। যিকির সাধারণতঃ দু'প্রকারঃ- যিকরে জলী বা উচ্চস্বরে আল্লাহ্‌র নাম আবৃত্তি এবং যিকরে খফী বা নীরবে আল্লাহ্‌র নাম আবৃত্তি। যিকরে খফীর মর্তবা বেশী। সূফী যাকের (স্মরণকারী) -কে আল্লাহ্‌র মধ্যে লীন হতে চার প্রকার যিকিরের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। যথা ঃ

(১) যিকরে লিসানী অর্থাৎ মুখ ও জিহবার দ্বারা আল্লাহ্‌র বিশেষ নাম উচ্চারণ বা আয়াত বারবার আবৃত্তি করা। কুরআন পাঠ, হাদীস ও দীন সম্পর্কে আলোচনা এবং আল্লাহ ও রসূল সম্পর্কিত কবিতা ও গযল পাঠ যিকরে লিসানীর অন্তর্গত।

(২) যিকরে কালবী অর্থাৎ কলব (হৃদয়ের) এর দ্বারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চাণর করা। এতে কলব এর আবর্জনা দুরীভূত হয়ে কলব আয়নার ন্যায় পরিস্কার হয় নুর-ই-তাজাল্লী কলব এর উপর প্রতিফলিত হয়ে যাকেরর আধ্যাত্মিক চোখে তা পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠে।

(৩) যিকরে আনফাসী বা শ্বাস-প্রশ্বাসের যিকির। এই যিকির মর্তবা খুব বেশী। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করাই এই যিকিরের নিয়ম। খেয়ালের মোকামের সাথে যিকরে আনফাসীর যোগসূত্র রয়েছে। এই যিকিরের দ্বারা সূফীরা সর্বদা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করেন।

(৪) যিকরে আয়নী বা চোখের যিকির। যিকিরকারীর এটাই হচ্ছে চরমতম ও উচ্চতম মার্গের যিকির। নুর-ই-তাজাল্লীকে দর্শনই এই যিকিরের মূল উদ্দেশ্য। কুরআনে এই যিকির সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "ফাআয়নামাতুয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ"। অর্থাৎ তুমি যেদিকেই তাকাও, আল্লাহ্‌র মুখ সেদিকেই। বর্তমান সব সময় আল্লাহ্‌কে আধ্যাত্মিক চোখে স্মরণ করাই এই যিকিরের কাজ। এই যিকিরের মোকাম উত্তীর্ণকারী সূফী আল্লাহর প্রথম শ্রেণীর আওলিয়া শ্রেণীভুক্ত। "লা ইলাহা ইল্লাহ" ও "আল্লাহ" এ দুইটি সাধারণতঃ যিকিরের মাধ্যমে বারবার আবৃত্তি করা হয়।

গ) কাশফ বা অতিন্দ্রিয় অনুভূতি ঃ

সূফী দর্শন অনুযায়ী কাশফ বা সজ্ঞা অতিন্দ্রিয় অনুভূতির মাধমেই সাধক আল্লাহ্‌কে জানতে পারেন। কাশফ এমন এক ধরনের অন্তদৃষ্টি, যার সাহায্যে সাধক ভূত ভবিষ্যত জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য, আত্মা, আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতকে জানতে প্রয়াস পান। পীর-ই-কামিলের ফয়েজ ও তাওয়াজ্জুহ (বুকের সাথে বুকের স্পর্শজনিত নৈকট্য প্রাপ্তির অবস্থা) কাশফ বা অন্তদৃষ্টি লাভের অপরিহার্য প্রাথমিক অবস্থা।

কাশফ দু'প্রকার ঃ যথা - কাশফে কাওনী ও কাশফে ইলাহি ভবিষ্যত কালের বা দূরবর্তী স্থানের দৃশ্য বা অদৃশ্য বিষয় সমূহের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়াকে কাশফে কাওলী বলে। সলুক বা শিক্ষা নির্দেশনা সম্পর্কে, যাত ও সিফাত সম্পর্কে ইলম হওয়াকে কাশফে ইলাহী বলে।

প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সূফীকে আল্লাহ সম্পর্কে কোন বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না। শুধু কাশফই সূফীকে আল্লাহ্‌র বাস্তব জ্ঞান দিতে সক্ষম। সূফী যখন আপন নশ্বর অস্তিত্ব বিলোপ করে ফানাফিল্লাহ্‌র গভীর তন্ময়তার মধ্যে বিদ্যমান হন, তখন তার অসীম অস্তিত্বের জ্ঞান অতিন্দ্রিয় অনুভূতি হিসাবে দিল দরিয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সাধনার উচ্চমার্গে সূফী কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহ্‌র অসীমতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন জাগতিক সর্বপ্রকার জ্ঞান ও অনুভূতিকে; নিজেতে বিস্মৃত হন অসীমতার নিবিড় প্রেম স্পর্শে গিয়ে এবং মুহূর্তেই সূফী আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ করেন। সূফীদের নিকট কাশফলব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

(ঘ) সামা ঃ

আল্লাহ প্রেমমূলক সঙ্গীতকে সামা বলে অবিহিত করা হয়। হামদ (আল্লাহর স্তুতি), না'ত (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রশস্তি) গযল (আল্লাহ প্রেমমূলক গান), মুরশিদী (পীর ও মুর্শিদ সম্পর্কিত সঙ্গীত), মারিফাতী (তত্ত্বমূকল গান), কাওয়ালী (হামদ না'ত, গযল, মুরশিদী প্রভৃতির রাগ ও ভাবপ্রধান সঙ্গীত), আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, দেশ প্রেমমূলক সঙ্গীত প্রভৃতিকে সামা বা বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পর্যায়ভূক্ত করা হয়ে থাকে। হযরত গাযালী (রা.) সঙ্গীতকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন; যথা- ১. মুবাহ ২. সদ্ভাব বর্ধক ও ৩. হারাম। উপরে বর্ণিত সামাসমূহ শ্রবণ করা মুবাহ ও সদ্ভাব বর্ধক পর্যায়ের অন্তর্গত। যে গান বাজনায়

অশ্লীলতা আছে, যৌন উদ্দীপক এবং মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে তা সম্পূর্ণ হারাম ও পরিত্যাজ্য। সুফিদের মধ্যে সবাই সঙ্গিত প্রিয় নন। আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বা সামার দ্বারা অন্তরে আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে জাগিয়ে এবং আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট করাই এই সঙ্গীতের আসল কাজ। কোন কোন সূফী সাধক এই সঙ্গীতকে 'রুহানী গেযা' বা আত্মার আহার্য বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, সামা এর শ্রবণকারীকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে টেনে নিয়ে যায় এবং মুহূর্তে সাধকের মনে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলে। সামা প্রকৃত শ্রবণকারীকে 'জজবার' (ভাবন্মোদনা) পর্যায়ে নিয়ে যায়। সাধারণ ঃ চিশতীয়া ও মৌলবীয়া তরীকার সূফিগণ সামা শ্রবণ করে থাকেন।

উপরিউক্ত শর্ত চারটি পূর্ণ হলে তবেই সামা জায়েয (বৈধ), নতুবা নয়। মোটকথা স্থান-কাল - পাত্র-ভেদে সামা বৈধ এবং তা আল্লাহ প্রেমিকদের আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির উদ্দীপক।

(ঙ) হাল ঃ

সূফীর ভাবানুভূতির বা আধ্যাত্মিক ও মানসিক এক বিশেষ অবস্থাকে "হাল" বলা হয়। সালিকের অন্তররাজ্যে যখন আল্লাহর মুহব্বতের বিশেষ নূর সৃষ্টি হয়, যা সূফীকে কাশফের মাধ্যমে সত্যের স্বরূপকে জানতে স্বভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতি তরঙ্গের সৃষ্টি করে তাকেই সাধারণতঃ 'হাল' বলা হয়। 'হাল' কাশফের অব্যবহিত পূর্ববস্থা। হাল সূফীমনের এমন এক ভিত্তি, যার উপর হৃদয়ানুভূতি বা আন্তদৃষ্টি গড়ে উঠে। যা ফানাফিল্লাহ অবস্থা লাভের জন্য বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেউ ইচ্ছা করলেই 'হাল' লাভ করতে পারে না। হাল আল্লাহর অনুগ্রহ ও অসীম দয়ার উপর নির্ভরশীল। হাল লাভ করার পর তাকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা সাধক করতে পারেন এবং যখন তা দীর্ঘয়িত ও স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন একে 'মাকামাত' বলা হয়। হালের বাহ্যিক বিকাশ হাসি, কান্না, উচ্ছাস, হাহুতাশ, উদাসীনতা, বৈরাগ্য প্রভৃতির মাধ্যমে ঘটে থাকে। আর এক শ্রেণীর হাল আছে, যাতে এই সব অবস্থা প্রকাশ পায় না, বরং সাধক চুপচাপ ও নিরিবিলি নিস্তব্ধ ভাব সাগরে নিমজ্জিত হতে থাকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই হাল শ্রেষ্ঠতর। হাল সূফীর আধ্যাত্মিক জীবনের এক চরম ও নিবিড় অভিজ্ঞতা।

(চ) ফানা ঃ

'ফানা' অর্থ আত্মবিনাশ।এই আত্মবিনাশ মানে আত্মার ধ্বংস নয়। কেননা আত্মা অমর, শাশ্বত ও চিরন্তন আত্ম-গরিমা, আত্ম-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, রিয়া, লোভ, লালসা, কামনা, নিন্দা, দুনিয়ার ভালবাসা প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা, গুণ ও কার্যাবলীকে পরিত্যাগ করা, মানবিক গুণ ও আত্মবোধকে ধ্বংস করা এবং তৎপরিবর্তে আল্লাহর গুণাবলী লাভ করা, যার অর্থ আল্লাহ্‌র সিফাতের মধ্যে সিফাতকে বিলীন করে দেয়া এবং সর্বশেষে আল্লাহর অসীম যাতের মধ্যে মানবিক সিফাতকে বিলীন করে দেওয়া এবং সর্বশেষে আল্লাহর অসীম যাতের মধ্যে বান্দার সসীম সত্তাকে লীন করে দিয়ে নিজ অস্তিত্ববোধকে ভুলে যাওয়াকে 'ফানা' বলে অভিহিত করা যায়। মোট কথা, সূফী নিস্কার বা কামনা ও ইচ্ছাকে বিদূরিত বা ফানা করে নিজস্ব অস্তিত্ববোধকে হারাতে পারলেই ফানা হওয়া সম্ভব। সমুদয় সৃষ্টি হতে ফানা হওয়ার অর্থ এই যে, সংসারের কোন মানুষ, জীব বা কোন কিছুই এ অবস্থায় সূফীতে আকৃষ্ট করতে পারে না। সূফী সকলের সাথে এ সময় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন, পার্থিব সর্বপ্রকার লোভ ও আশাকে হত্যা করে আসক্তি লিপ্সার পরিবর্তে নিঃসঙ্গতা পছন্দ করেন। সংসার লাভ, ক্ষতি ও উপার্জনের প্রতি তার চেষ্টা, যত্ন বা চিন্তা থাকে না এবং এ সময় সাধকের আত্মকেন্দ্রিকতা ধ্বংস হয়ে যায়। সাধক সমুদয় ব্যাপারে এসময় আল্লাহর উপর নির্ভর ও আত্মসমর্পন করেন। সর্বপেক্ষা কামনা ও ইচ্ছা (ইরাদা) হতে ফানা প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এ সময় সাধকের কোন নিজস্ব উদ্দেশ্য বা খাহেস থাকে না। একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া সূফী এসময় আর কিছু চান না। ভাল-মন্দ, সুনাম, দুর্নাম, কোন কিছুতেই সাধকের মনভাবে কোন পার্থক্য বা পরিবর্তন ঘটে না। আপন-পর বলে কোন পার্থক্যই সাধকের মনে এ সময় থাকে না। আল্লাহ্‌র অসীম ইচ্ছাতেই তাঁরা সামান্য ইচ্ছা সমর্থিত হয়। এভাবে আত্মার পাশবিক (নফসে আম্মারা) প্রবৃত্তি ও মানবিক গুণাবলি ধ্বংস হলে তা আল্লাহর সম্মিলনের (ওয়াসিল) উপযুক্ত হয়। এ ফানা সম্পর্কেই হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, "মূ তূ কাবলা আন তা-মূ তূ" অর্থাৎ 'মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুবরণ কর'। এ মৃত্যু বা ফানা বরণ করতে হলে প্রেমই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম। প্রেম ব্যতীত কেউ এই ফানার স্তরসমূহ উত্তরণ করতে পারবে না। তাই নিজ অস্তিত্ববোধকে অসীম অস্তিত্বের মধ্যে হারানোর জন্য সাধক এ সময় প্রেম মদিরা পান করেন। হযরত জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) এজনাই বলেছেন-

চলবে।

রাসূল (দ.)-এর রওজা যিয়ারতের হাদিস নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির নিরসন ঃ (২)

- শহিদুল্লাহ বাহাদুর

৫ নং হাদীসের পর্যালোচনা ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় উক্ত সহিহ হাদিস অত্যন্ত যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।

عَنْ انس بْن مَالِكٍ، انْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "قال السيوطى هذا حديث حسن-

-"হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে মদীনা মুনাওয়ারা হাজির হয়ে আমার যিয়ারত করবে কিয়ামত দিবসে আমি তার সাক্ষী এবং শাফায়াত কারী হব।" [১] ইমাম সুয়ূতি (রহ.) বলেন এই হাদিসটি হাসান।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উক্ত হাদীসের এক বর্ণনাকারী "আবুল মুসান্না সুলাইমান ইবনু ইয়াযিদ" নামক রাবীকে দ্বঈফ প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ উক্ত রাবীকে মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনে হিব্বান সহ আরও অনেক হক্কানী মুহাদ্দিস সেকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

৬ নং হাদীসের পর্যালোচনা ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদিস উল্লেখ করেন এই হাদিসটি জাল।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي فِي مَمَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي-

-"যে ব্যক্তি হজ্ব করতে এসে আমার ওফাতের পরে আমার রওযা যিয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবদ্দশাতেই আমার যিয়ারত বা সাক্ষাত করল।"[৩]

সনদ পর্যালোচনা ঃ ইমাম হাইসামী (রহ.) বলেন,

رواه الطبراني في الكبير، والأوسط وفيه حفص بن أبي داود القاري، وثقه أحمد، وضعفه جماعة من الأئمة.

"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী মু'জামুল কবীর ও মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসের সনদে 'হাফস বিন আবি দাউদ ক্বারী' রয়েছেন তিনি ইমাম আহমদ (রহ.) এর নিকট সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী কিন্তু এক জামাত মুহাদ্দিসদের নিকট সে দুর্বল রাবী।"[১] পৃথিবীর সাতজন শ্রেষ্ঠ ক্বারীদের মধ্যে হাফস অন্যতম। তবে তিনি ক্বেরাতের প্রতি বেশী মনযোগী হওয়ায় হাদিসের প্রতি বেশী যত্নবান বা পরিশ্রমী হননি।

ইমাম হাইসামী অন্য স্থানে উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন যে,

رواه الطبراني، وفيه حفص بن سليمان القاري، وثقه وكيع وغيره، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.مجمع الزوائد : 163\10

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন উক্ত হাদীসে একজন রাবী 'হাফস বিন সুলায়মান ক্বারী' রয়েছেন, তাকে ইমাম ওকী এবং অন্যান্য ইমামগণ সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন, তবে অনেক হাদিসের ইমামগণ তাকে দুর্বল বলেছেন।"[২]

সর্বোপরি উক্ত রাবীকে দ্বঈফ বা দুর্বল বলা থেকে বিরত থাকাই উচিত। উক্ত হাদীসে 'হাফস বিন সুলাইমান ক্বারী' সম্পর্কে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব মন্তব্য করেছেন যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাকে সিকাহ বলেছেন। আমরা বলবো ইমাম আহমদ (রহ.) উক্ত রাবীর কাছাকাছি যুগের লোক তাই তিনি তাকে চিনতেন তাই তাকে সিকাহ বলেছেন। অন্য সব মুহাদ্দিস অনেক পরের তারা অন্য আরেকজন থেকে শুনে তাকে দ্বঈফ বা দুর্বল বলেছেন। তার মিথ্যা হাদিস রটানোর কোন অপবাদ আছে বলে কোন মুহাদ্দিস বলেননি। তাই ইমাম আহমদ ও ইমাম ওকী এবং অন্যান্যদের মতে হাদিসটি সহিহ। আর অন্য ইমামদের মতামত ধরা হলেও হাদিসটি "হাসান" হতে কোন অসুবিধা নেই। দেখুন আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী (রহ.) একটি হাদিস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেন,

رواه ابن لهيعة و فيه ضعيف و هو حسن حديث-
مجمع الزوائد ٥/١٥٢ و ١٣٠/١٣

অর্থাৎ- উক্ত হাদীসে ইবনে লাহিয়াহ (রহ.) তিনি দুর্বল রাবী, তবে উক্ত রাবী দুর্বল হলেও হাদিসটি "হাসান"। অতএব হাইসামী (রহ.) এর মত দ্বারা বুঝা গেল একজন রাবী দুর্বল হলেও হাদিস সহিহ না হোক কিন্তু তা "হাসান" হতে কোন অসুবিধা নেই। তাই উক্ত হাদিসটি "হাসান" গ্রহণযোগ্য। আর ইমাম আহমদ (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও ইমামদের মতামতের মত গ্রহণ করা হলে হাদিসটি সহিহ বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে ইমাম ওকী, ইমাম যাহাবী, ইমাম আহমদ এবং মুহাক্কীক আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন- صالح অর্থাৎ- তিনি ছিলেন হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ অন্য বর্ণনায় ইমাম যাহাবী বলেন, ثقة তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। তাঁর থেকে সুনানে তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ এবং নাসায়ীর মুসনাদে আলীতে হাদিস সংকলন করেছেন।

অপরদিকে ইমাম আদি, বুখারী, আসকালানী প্রমুখ বলেন যে, তিনি অনেক বড় ক্বারী ছিলেন। তাই তিনি ক্বেরাতের প্রতি বেশী যত্নবান হওয়ার কারণে হাদীসের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন নি। তাই তার থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো সংরক্ষিত নয়। আল্লামা হাইসামী বলেন- "আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন তবে ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ গ্রন্থে সেকাহ রাবির তালিকায়

---

[১]. ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৬/৫০পৃ.হাদিস :৩৮৭০,ইমাম সুবকী : শিফাউস সিকাম-ফি যিয়ারাতিল খায়রিল আনাম :১৫পৃ.,ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৩/৩২১পৃ.রাবি.৩৫২৪, ইবনে হাজার আসকালানী : তালখিসুল হাবীর : ২/২৬৭ পৃ.,ইমাম জুরজানী : তারীখে জুরজান :১/২২০পৃ., কাজী শাওকানী : নায়লুল আউতার : ৫/১৭৯ পৃ.,ইমাম সুয়ূতী : জামেউস সগীর : ২/৬০৫ পৃ.হাদিস : ৮৭১৬,জালালুদ্দীন সুয়ূতী : জামিউল আহাদিস : ২০/৩৪৯পৃ. হাদিস,২২০০৬, শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২০৬পৃ., মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ.,ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ২/১০২ পৃ.,মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১৫/৬৫১ পৃ. হাদিস : ৪২৫৮৪, জুরজানী, তারীখে জুরজান, ১/৪৩৩পৃ. ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবির,২/২৬৭পৃ.ও ৫৭০পৃ. ক্রমিক নং.১০৭৫, ইমাম ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ২/৬৬৬পৃ.শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/১৮৬পৃ. হাদিস:১১৮২৩, যিয়া মুকাদ্দাসী, আল মুনতাকী মিনাল মুসমুআত, ১/২৭৭পৃ.হাদিস.৫১৫, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুষ যঈফাহ, ১০/১১২পৃ. হাদিস:৪৫৯৮, তিনি বলেন হাদিসটির সনদ যঈফ।

[২].দ্র. ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সিক্বাত : ৬/৩৯৫ পৃ. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল ২/১৭৭ পৃ. রাভী, ৩৮৭৫, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৭/৪৮১পৃ. মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৩৪/২৫৬পৃ. ক্রমিক নং.৭৬০২, ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ১২/২৪২ পৃ

[৩].দ্র.বায়হাকী : সুনানে কোবরা : ৫/২৪৬ পৃ.,বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৪৮৯ পৃ. হাদিস : ৪১৫৪,ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১২/৪০৬ পৃ. হাদিস : ১৩৪৯৭,তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ১/৯৫ পৃ. হাদিস : ২৮৭,ইমাম দারেকুতনী : আস সুনান : ১/২১৭পৃ.হাদিস : ২৬৬৭,ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৫৫০ পৃ. রাবী : ২৩৬৯, ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী : শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারতি খাইরিল আনাম ১৭ পৃ. হায়সামী : মাযমাউস যাওয়াইদ : ৪/২ পৃ., সুয়ূতী : জামেউস সগীর : ২/৫২৪ পৃ: হাদিস : ৮৬২৮, ইমাম সুয়ূতী : জামেউল আহাদিস : ৭/১৯ পৃ: হাদিস : ২০৫৫১. কাজী শাওকানী : নায়লুল আওতার : ৫/১১৩পৃ., মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল : ১৫/৬১৫ পৃ. হাদিস : ৪২৫৮২, ইবনে নাজ্জার, আখবারে মদিনা, হাদিস : ১৫৬১, ইস্পাহানী, তারগীব ওয়াতারহীব, ২/২৭পৃ. হাদিস : ১০৮০, ইবনুল মুলাক্কিন, বদরুল মুনীর, ৬/২৯৩পৃ. ভুয়া তাহকীককারী আহলে হাদিস আলবানী, যঈফাহ, হাদিস নং- ৪৭ এ তিনি বলেন হাদিসটির সনদটি জাল।

[১]. ক. হায়সামী, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ৪/২পৃ.

[২]আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউজ যাওয়ায়েদ : ১০/১৬৩ পৃ:

আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউজ যাওয়াইদ : ৮/১০২ এবং ১০/১৭০ পৃ

ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৫৫১-৫৫০ পৃ. রাবী : ২০৬৯

ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল : ৩৪/১-৮৭ রাবী:২০৬৯

ক. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৫৫১ পৃ. রাবী : ২০৬৯

খ. আসকালানী : লিসানুল মিযান : ২/৩৬৪ পৃ. তাকরিবুত তাহযীব : ১/১৭২ পৃ., তারিখুল ইসলামী, ৪/৬০২পৃ. হাদিস-২৫

অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১] বুঝা গেল হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের, তাতে কোন সন্দেহনেই।

৭ নং হাদীসের পর্যালোচনা ঃ

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৪৭০ পৃষ্ঠায় একটি গ্রহণযোগ্য হাদিসকে অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি হল-

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "«من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي»-و قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير، والأوسط وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمها.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় যিয়ারত করল।"[২]

আল্লামা হাইসামী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী মুজামুস সগীর এবং মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে "আয়েশা বিনতে ইউনূছ" এর জীবনী আমি পাইনি, (বাকী রাবীর উপর কোন অভিযোগ নেই)।

উক্ত হাদীসের সনদ বর্ণনা ও গবেষণায় ইমাম হাইসামী (রহ.) বলেন, এই হাদীসের শুধুমাত্র একজন রাবী আয়েশা বিনতে ইউনূছ তাঁর জীবনী আমি পাইনি। তাই বুঝা গেল উক্ত হাদীসের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত কেননা সবার জীবনী তিনি পেয়েছেন শুধুমাত্র উক্ত রাবীর জীবনী তিনি পাননি। তাই প্রমাণিত হয়ে গেল বাকী রাবীর মধ্যে কেউ দ্বঈফ নেই আর দ্বঈফ থাকলে অবশ্যই তিনি বলতেন কেননা সবার জীবনীই তার জানা। তাই আমরা বলতে চাই উক্ত রাবীটি দ্বঈফ ধরে নেওয়া হলেও হাদিসটি "হাসান" হওয়াতে অসুবিধা নেই, কারণ,কোনো হক্কানী মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসটিকে জাল বা বানোওয়াট বলেন নি। তবে এই রাবীর জীবনী না পাওয়ার কারণে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহ.) উক্ত হাদিসকে দ্বঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

কিন্তু আহলে হাদিস আলবানীর মত আজ পর্যন্ত কেউ মওদু বা বানোয়াট বলেন নি।[৪]

৮ নং হাদীসের পর্যালোচনা ঃ

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৪৭০ পৃষ্ঠা হতে ৪৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য হাদিসকে ইবনে তাইমিয়া এবং নাসিরুদ্দিন আলবানীর বক্তব্যের মাধ্যমে জাল প্রমাণ করার অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছে।

عن رجل من آل حاطب، عن حاطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة.

"হযরত হাতেব (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার রওযা যিয়ারত করল সে যেন আমার জীবিত অবস্থাতেই আমার জিয়ারত করল। যে ব্যক্তি দুই হারামাঈন শরীফ হতে যে কোন এক স্থানে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে নিরাপত্তা সহ উঠাবেন।"[৫]

[১]ইমাম হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/১৪৮পৃ.হাদিস : ১৮৯৫, ও ১/৩২৮পৃ. হাদিস, ১৮৫০, ৯/২৪৭পৃ. হাদিস,১৫৩৪৪, ও ১/১২২পৃ. হাদিস,৪৯৬

[২]ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১২/৪০৬ : হাদিস : ১৩৪৯৬, ইমাম তাবরানী : মু'জামুস আওসাত : ১/৯৪ : হাদিস :২৮৯, ইমাম তাবরানী : মু'জামুস সগীর : ১/২০৯ পৃ হাদিস :,ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৪/২ পৃ, আল্লামা তাহের সালাফী : মাশায়েখে বাগদাদিয়্যাহ : ২/৫৪ পৃ. ইবনে নাজ্জার, আখবারে মদিনা, ১/১৫৫পৃ. তবে তিনি হযরত আনাস এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মোবারকপুরী, মিরআ'ত, ৯/২৫৬পৃ. হাদিস:২৭৮২।

[৩]ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী : জামেউস সগীর : ২/৬২৭ পৃ. হাদিস : ৮৬২৮

[৪]আলবানী : দ্বঈফাহ : ১/১২৩ পৃ. হাদিস : ৪৭

[৫]বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৮৮পৃ. হাদিস,৪১৫১, বায়হাকী : সুনানে কোবরা : ৫/২৪৫, দারেকুতনী : সুনান : ২/২৭৮ : হাদিস : ১৯৩, ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৬/১৮০ পৃ. তিনি হযরত ইবনে উমর হতে, যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/২৬২ পৃ. রাভী : ৯৬৬৫,তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১২/৩১০ পৃ: হাদিস,১৩৪৯৭, সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৭৩ পৃ. হাদিস : ১১২৩,আজলুনী : কাশফুল খাফা : ২/২২৪ পৃ. হাদিস নং- ২৪৮৭, কাজী শাওকানী : নায়লুল আওতার : ৫/১৭৯ পৃ.,ইবনে হাজার আসকালানী : তালখিসুল হাবির : ২/২৬৭ পৃ.ইবনে আসাকীর, ইত্তিহাফুল জায়েরা, ১/২৫পৃ.ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তিহাফুল মুহরাত, ৪/১৯৬পৃ. হাদিস : ৪১২৫, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস: ২০/৩৪৯পৃ. হাদিস : ২২৩০৭,

হাদিসটির দুটি সনদ রয়েছে, একটি সনদ হযরত হাতেব (রা.) হতে অপরটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে।

হাদিসটিকে গ্রহণযোগ্য কোন মুহাদ্দিস জাল বা বানোয়াট বলেননি। ইবনে তাইমিয়া ও নাসিরুদ্দিন আলবানীই শুধু জাল বলার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। "হারুন আবু কুযা'আহ" সম্পর্কে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, এই ব্যক্তির হাদিস ভিত্তিহীন। দেখুন ইমাম বুখারীর নামে কেমন মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন অথচ ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন : لا يتابع عليه তার হাদিস বিশুদ্ধ স্তরের মোতাবেক হতো না।[১]

দেখুন ইমাম বুখারী কী বলেছেন যে, তার হাদিস ভিত্তিহীন? উক্ত রাবী সম্পর্কে দ্বঈফ ধারণা করা হলেও উক্ত হাদিসটি "হাসান" হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

রাবী সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) এরও পূর্বের গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস ওকী ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৭ হি:) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অপর আরেক সনদ ইউসূফ ইবনু মুসা (৩য় শতকের মুহাদ্দিস) হতে বর্ণিত হয়েছে। আমরা কিতাবের শুরুতেই আলোচনা করেছি, হাদিস যদিও দ্বঈফ হোক না কেন একাধিক সনদে বর্ণিত হলে তা "'হাসান'" পর্যায়ের হয়ে যায়। আর "হাসান" হাদিস গ্রহণযোগ্য ও দলীল যোগ্য।

তবে হাদিসটির ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে, উক্ত হাদিসের তৃতীয় আরেকটি সনদ রয়েছে যা তাবরানী মু'জামুল কবীরে ১২/৩১০ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ২৬৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, একাধিক সনদে দ্বঈফ হাদিস বর্নিত হলেও মিথ্যাবাদী রাবী না থাকলে হাদিস "হাসান" হয়ে যায়। তাই তার ফতোয়ায় হাদিসটি "হাসান"। গ্রহণযোগ্য দলীল হিসেবে প্রয়োগ করা যাবে। তবে এটি ঠিক যে, ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) হযরত হাতেবের সনদকে বলেন এটি মুরসাল। আর রাভী হারুন বিন কুযা'ঈ দুর্বল রাভী হিসেবে পরিচিত। এই দুটি কারণে উক্ত সনদটি (প্রথম সনদ) দুর্বল।[২] তবে হাদিসটির যেহেতু একাধিক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে তাই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য।

অপরদিকে ইমাম যুরকানী (রহ.) বলেন-

و قال الحافظ : حديث غريب، اخرجه ابن خزيمة فى صحيحه- شرح المواهب، ١٨٠/١٢

"আল্লামা হাফেয ইবনে হাযার হাদিসটিকে গরীব বলেছেন। তবে ইমাম ইবনে খুযায়মা সহিহ সনদে তাঁর একটি গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"

শুধু তাই নয় ইমাম সুবকী বলেন- بل حسن او صحيحه অর্থাৎ- উক্ত হাদিসটি 'হাসান' অথবা সহিহ এর মর্যাদা রাখে।[৩]

৯ নং হাদীসের পর্যালোচনা ঃ

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৪৭২ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করার অনেক অপচেষ্টা করেছেন। উক্ত হাদিসটি হলো-

عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما من احد من امتى له سعة ثم لم يزرنى الا و ليس له عذر- رواه النجار فى التاريخ المدينة

-"হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : আমার কোন উম্মতের সচ্ছলতা বা সুযোগ থাকে, তা সত্ত্বেও সে আমার সাথে সাক্ষাত বা যিয়ারত করলো না, তাহলে তার কোন অজুহাত বা ক্ষমা নেই।"[৪]

[১]ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/২৬২ : পৃ. রাবী নং- ৯৬৬৫

[২]আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৬/২১৮ পৃ.

[৩]ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.

[৪]ক.ইবনে নাজ্জার,আখবারে মদিনা,১/১৫৫পৃ.হযরত আলী হতে ও ১/১৫৫পৃ. এটি হযরত আনাস হতে সংকলন করেন। ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৩৪ পৃষ্ঠা হাদিস নং ১১৭৮,আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৩৬৬ পৃষ্ঠা হাদিস : ২৪৮৭,ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৬/১১৮পৃ.তকী উদ্দীন সুবকী : শিফাউস সিকাম : ২১ পৃ.ইবনে হাজার মক্কী : যাওয়াহিরুল মুনাজ্জাম : ২৮,শায়খ ইউসুফ নাবহানী : শাওয়াহিদুল হক্ব : ৮২ পৃ.,মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০পৃ.,সাখাভী : আল-মাকাসিদুল হাসানা : ৪৯০ পৃ. হাদিস : ১১৭৬,আযলূনী : খাশফুল খাফা : ২/২৪৮ পৃ. হাদিস : ২৬১১,ইমাম যাহাবী : মি'যানুল ই'তিদাল : ৪/২৪৪ পৃ. রাভী, ৯৫৯১,ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ৩/১৮৫ পৃ., ইমাম বাকী যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত,লেবানন, ইবনুল মুলাক্কিন,বদরুল মুনীর,৬/২২৯পৃ.

আর তারা দাবী করেছে সনদে একজন রাভী 'জাফর ইবনু হারুন' নামক 'মিথ্যাবাদী রয়েছেন। আমি বলবো তাহলে বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইমামগণ অবশ্যই প্রকাশ করতেন. আমার কাছে ইমাম ইবনে নাজ্জারের গ্রন্থটি না থাকায় আমি উক্ত সনদে উক্ত রাবীটি আছে কিনা যাচাই করে দেখতে পারিনি। তাই দুজন গ্রহণযোগ্য ইমামের রায় গ্রহণ করায় আমাদের জন্য উচিত। আর আমি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবকে বলছি. আপনি কি! তাদের চেয়েও বড় মুহাদ্দিস হয়ে গেলেন?

তবে এতটুকু সত্য যে উক্ত রাবী দ্বঈফ পর্যায়ের আর উক্ত হাদিসটির দুটি সনদ রয়েছে। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন.

و عن انس بسند ضعيف بلفظ: ما من احد من امتى له سعة ثم لم يزرنى الا و ليس له عذر و عن ابن عدى بسند يحتج به من حج البيت و لم يزرنى فقد جفانى- شرح الشفا:২\১৫০

"হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে দ্বঈফ সনদে তার শব্দ যেমন .... আর ইমাম আদি প্রমাণযোগ্য সনদে বর্ণনা করেন যে,)ইবন ওমর (রা.) থেকে)যে হজ্ব করল অথচ আমার রওযা যিয়ারত করলনা সে আমাকে কষ্ট দিল।"[১] তাই বুঝা গেল ইমাম আদির সনদটি গ্রহণযোগ্য।

শুধু তাই নয় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) উক্ত হাদিসটির অন্য আরেকটি সনদ আছে বলে উল্লেখ করে বলেন-

لم يزر قبرى فقد جفانى و جاء عند موقوفا- شرح شفا:২/১৫১

---

[১]আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ.

"যে আমার রওযা যিয়ারত করল না সে আমাকে কষ্ট দিল। এই রেওয়ায়েতটি মওকুফ সূত্রে আমাদের নিকট এসেছে।"[২]

১০ নং হাদীসের পর্যালোচনা ঃ

যে হজ্ব করতে এসে আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করল না সে যেন আমাকে কষ্ট দিল ঃ

উক্ত হাদিসটি ইমাম গায্যালী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইহইয়াউল উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন من وجد سعة ولم يفد الى فقد جفانى- "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার রওযা যিয়ারত করলো না সে যেন আমাকে কষ্ট দিন। হাদিসটি সম্পর্কে আল্লামা ইরাকী তাঁর তাখরীজে ইহইয়া গ্রন্থে কিছুটা দুর্বলতা আছে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত হাদীসের সমর্থনে ইমাম ইবনুল নাজ্জার (রহ.) তার প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ তারীখে মদিনা গ্রন্থ থেকে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

অপরদিকে "হাসান" সনদে ইমাম আদি (রহ.) তার কামিল গ্রন্থে, ইমাম ইবনে হিব্বান তার দ্বঈফাহ গ্রন্থে, ইমাম দারেকুতনী (রহ.) তার ইল্লুল গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, من حج و لم يزرنى فقد جفانى- অর্থাৎ- যে ব্যক্তি হজ্ব করতে আসলো কিন্তু আমার রওযা জিয়ারত করলো না (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) সে যেন আমাকে কষ্ট দিল।[৩]

---

[২] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫১ পৃ.

[৩] ক.সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৯০ পৃ. হাদিস : ১১৭৬, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৪৮ : হাদিস : ২৬১১, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২৪৪পৃ. রাবী-৯৫৯১, আদি-আল-কামিল, ৮/২৪৮পৃ. ক্রমিক,৯১৫৬, নু'মান বিন শাবল এর জীবনীতে।

আহকামুল মাজার কিতাবখানা ঈমান ও আকিদা বিশুদ্ধ করার হাতিয়ার

- মোহাম্মদ আবুল হাশেম

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

নবী-রাসূল, অলি-আল্লাহদের মাজার ইসলামী নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। মাজার জিয়ারতে মুসলমানদের আকিদা মজবুত হয়। মাজারগুলো মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র। এমনকি অনেক বিধর্মীরাও মাজার জিয়ারত করেন এবং উপকারও লাভ করে থাকেন। মাজার জিয়ারতে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি হয়। আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ ঘটে- পরকালের কথা বেশী বেশী স্মরণে আসে। হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রওজা মোবারক ও অন্যান্য মাজার ও কবর জিয়ারতের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীস শরীফে নজীজীর ফজিলত বর্ণনা করে এরশাদ করেন ঃ

[মান যারা কৃবরী ওয়াজাবাত লাহু শাফায়াতী অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার কৃবর (রওজা) মোবারক জিয়ারত করবে, তার জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

আহকামুল মাজার
(মাজারের বিধান)

খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতি আজমিরী (রঃ)-এর মাজার শরীফ
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল

আল্লাহ পাক তাঁর গজবে পতীত স্থান ও জনপদগুলো ভ্রমণ করার জন্য কুরআন মজিদে নির্দেশ দিয়েছেন তেমনিভাবে নেক্কার ও অনুগ্রহ প্রাপ্তদের দিনসমূহ ও স্থানসমূহ স্মরণ করা, পালন করা এবং তথায় গমন করার নির্দেশও কুরআন মজিদেই এসেছে। সুতরাং অলি-আল্লাহদের মাজারসমূহ জিয়ারত করা, তাঁদের জন্ম-মৃত্যু স্মরণ করা ও পালন করার লক্ষ্যেই "উরস ও মাজার" সম্পর্কিত দলিল ভিত্তিক "আহকামুল মাজার" অর্থাৎ মাজারের বিধান কিতাবটি হুজুর আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন।

উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত অলি-আল্লাহ হযরত খাজা মুঈন উদ্দিন চিশতি আজমিরী (রহঃ)-এর মাজার শরীফ সম্বলিত প্রচ্ছদে আকায়িদের কিতাব উপহার দিয়ে গেছেন অধ্যক্ষ হাফেয এম. এ জলিল (রহঃ)। দশ অধ্যায়ে রচিত আহকামুল মাজার কিতাবখানা মাজার ও উরস বিদ্বেশী লোকদের জন্যে একটি সময়োচিত কিতাব। বাতিল ফের্কার লোকদের জন্যে এই কিতাবটি খুবই কাজে লাগবে এবং তাদের মাজার বিদ্বেশীভাব দূর করবে। হুজুর অধ্যক্ষ হাফেয এম. এ জলিল (রহঃ) এ কিতাবটি দশটি অধ্যায়ে শেষ করার পেছনে একটি ঘটনা নিহীত আছে। তাহলো বার্মার সুলমেন থেকে হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব হুজুরের খেদমতে দশটি প্রশ্ন সম্বলিত একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। এগুলোর জবাব দিতে গিয়ে আহকামুল মাজার বিশুদ্ধ আকিদার গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

অধ্যক্ষ হাফেয এম. এ জলিল (রহঃ) কুরআন এবং হাদিসের আলোকে আউলিয়া কেরামদের শান-মান এবং নবী-রাসুলগণের মাজার জিয়ারতের বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর পথে অছিলা তালাশ কর"। "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদিকীনদের (অলিগণের) সঙ্গলাভ কর।"

হুজুর উক্ত কিতাবে শরীয়ত মতে উরস শরীফ জায়েজ ও উত্তম কাজ তা প্রমাণ করেছেন। এবং উরস শরীফ জায়েজ এর দলিল ও প্রমাণাদি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের ঘরে একটি করে

কিতাব থাকা দরকার বিদাতীদের মোকাবেলা করার জন্যে।

হুজুর মাওঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দীর লেখা কিতাব ফতুয়ায়ে রশিদীয়ার বরাতে নবী করিম (দঃ)-এর চাচা হযরত আমীর হামযা (রাঃ)-এর উরশ শরীফ মদীনা শরীফের উলামায়ে কেরামগণ পালন করে আসছেন। সুতরাং অলি আল্লাহগণ ছাড়াও সাহাবীগণের উরশ শরীফ যে মদিনা শরীফে প্রচলিত ছিল- তাও প্রমাণ করে দিয়েছেন।

উরশ বিরোধী বিদাতি লোকদের আপত্তি ও তার জবাব খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। যা পড়লে আমাদেরও জবাব দিতে সুবিধা হবে। সুতরাং কিতাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অতিব মূল্যবান।

কিতাবটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ এবং সুন্নত। এর উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। মাজার জিয়ারত সম্পর্কে ভ্রান্ত মতামত ও এ কিতাব দ্বারা খন্ডন করেছেন তিনি।

অধ্যক্ষ হাফেয এম. এ জলিল (রহঃ) এ কিতাবের তৃতীয় অধ্যায়ে আওলিয়া কেরামের মাজারের উপর ছাদ ও গম্বুজ নির্মান করা, মাজার পাকা করা এবং চতুস্পার্শে দেয়াল নির্মান করা যে জায়েজ তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা কুরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায় মাজারে মোমবাতি জালানো এবং আলোকসজ্জা করা জায়েজ। পঞ্চম অধ্যায় মাজার গিলাপ দ্বারা আবৃত করা, মাজারে ফুল দেয়া ও আতর গোলাপ ছিটানো জায়েজ। ষষ্ঠ অধ্যায় মাজার চুম্বন করা বা মাজার প্রদক্ষিণ করা জায়েজ। সপ্তম অধ্যায় অলি-আল্লাহগণের নিকট রুহানী প্রার্থনা করা জায়েজ। অষ্টম অধ্যায় আউলিয়া কেরামের মাজার বা তাঁদের নামে মান্নত করা জায়েজ। জিয়ারত ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মহিলাদেরও মাজারে গমন করা জায়েজ। এবং দশম অধ্যায় মাজার জিয়ারতের নিয়ম ঃ মাজারমুখী হয়ে মোনাজাত করা ও অলিগণের ওছিলা ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা জায়েজ ও সুন্নত ইত্যাদি বিষয়ের উপরে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। এবং মাজার বিরোধিদের প্রশ্নও জবাব এই কিতাবে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মুবারক জিয়ারতের নিয়মাবলী তুলে ধরেছেন। হুজুর পাক (দঃ)-এর দরবারে অর্থাৎ রওজা মোবারকের সামনে গিয়ে কিভাবে সম্বোধন করবেন তা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ হুজুরের লেখা আহকামুল মাজার কিতাবটি পড়লে কোন মাজার বিদ্বেষীই আপনের সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে না। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত উক্ত কিতাবখানা মনোযোগ সহকারে পড়া এবং ঈমান ও আকিদাকে মজবুত করা। হুজুরের লেখা কিতাবগুলোর মধ্যে আহকামুল মাজার কিতাবটিও যথেষ্ট মুল্যবান কিতাব। "সত্যের অনুসরণ বাঞ্ছনীয় এবং এতেই মঙ্গল নিহীত"।

সুমাইয়া সার্জিক্যাল

এখানে সকল প্রকার হাসপাতালের মালামাল পাওয়া যায়। ডায়বেটিক, প্রেসার ও ওজন মাপার মেশিন, নেবুলাইজার ডিজিটাল বিপি ও থেরাপি মেশিন, বডি ম্যাসেঞ্জার, জ্বর মাপার থারমোমিটার এবং যাবতীয় সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ইকুইপমেন্ট সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

*ঢাকায় মালামাল হোম ডেলিভারি দেয়া হয়।

১৫/২ তোফখানা রোড, বি.এম.এ ভবন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৯৫৫৫২০৪, মোবাইলঃ ০১৭১১৫৯২৬৫৮, ০১৭১২২৩৫৫১৩

পবিত্র আশুরা ও হাফতনামা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

চান্দ্রবর্ষ পরিক্রমায় 'আশুরা' (১০ মুহাররম) এক অতি গুরুত্ববহ দিন। আল্লাহ পাকের কুদরতের মহিমা যে, এ দিনে বিশ্ব ইতিহাসের বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেক বান্দাদের উপর করেছেন মহা অনুগ্রহরাজি; পক্ষান্তরে বহু বিশ্বধিক্কৃত পাপী-যালিমকে দিয়েছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। বলাবাহুল্য, নেক বান্দাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যেমন আনন্দময়, পীর-যালিমদের ধ্বংসও তেমনি ভূ-পৃষ্ঠ ও দুনিয়াবাসীর জন্য কল্যাণকর। সর্বোপরি, এ দিনটি আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বরকতময়। তাই এ দিনটিকে শরীয়তসম্মত উপায়ে উদযাপন করলে অভাবনীয় কল্যাণ, সাওয়াব, সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের নৈকট্য লাভ করা যায়। এ দিনটি শরীয়তের নিয়মানুসারে উদযাপন করা যায়- রোযা পালন (দুটি রোযা ৯-১০ অথবা ১০-১১ মুহাররম), বিশেষভাবে গোসল করা, (ইসমাদ) সুরমা লাগানো, রোগীর পরিচর্যা, শরবৎ পান করানো, নফল নামায (বিশেষ নিয়মে চার রাকআত) ও দান-খয়রাত ইত্যাদি দ্বারা। এ দিনের অন্যতম বিশেষ নেক কাজ হচ্ছে-'হাফতদানা' (সাতদানা)র ফাতিহাও। আমাদের দেশে আশুরার দিনে পরিবার-পরিজনের জন্য উন্নতমানের হালাল খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থার সাথে সাথে 'হাফতদানা'র ফাতিহারও আয়োজন করা হয়। যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ নিয়মটির পক্ষেও রয়েছে শরীয়তের বহু অকাট্য দলীল। এ নিবন্ধে আশুরার অন্যান্য নেককার্যাদির সাথে 'হাফতদানা' ও উন্নতমানের খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গে সপ্রমাণ আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

বিশ্ববরেণ্য ইমাম আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল জাওযী আল কোরাশী আত-তামামী আল বাকারী আল হাম্বলী (ওফাত ৫৯৭ হিজরি) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রসিদ্ধ 'বুস্তানুল ওয়াক-'ইযীন' ও 'রিয়াযুস সাল্বিন'-এ মজলিস নম্বর ১৫. আশুরার দিনের ফজীলত প্রসঙ্গে বর্ণনায় লিখেছেন- হুজুর সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নবীর উম্মতদের তুলনায় দীর্ঘজীবন দান না করলেও তাদেরকে অনেক বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করেছেন। তাদেরকে অতি কম সময়ে, সহজতর উপায়ে স্বল্পতর সৎকার্যাদির মাধ্যমে বহু উন্নত মর্যাদা লাভ করার সুযোগ দান করেছেন। বিশেষতঃ তাদেরকে এমন কিছু দিন ও রাত দিয়েছেন, যেগুলোতে নির্দিষ্ট কিছু নেক কাজ করলেই তারা আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও অগণিত সাওয়াব এবং দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হয়ে যায়। যেমন-'আইয়্যামে বীয' (প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ), আরাফাহ দিবস, ১লা রজব, ২৭ শে রজব, অর্ধ শাবানের রাত (শবে বরাত), শবে কুদর, ঈদুল ফিতর ও এর পরবর্তী শাওয়ালের ছয় দিন, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, মুহাররাম মাসের ১০ম দিন (আশুরা- দিবস) ওই সব বরকতময় দিনের মধ্যে অন্যতম। এ দিনে বান্দাদের পাপরাশি ক্ষমা করা হয়, দান-সাদক্বাহ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, রোযা পালন করলে অকল্পনীয় সাওয়াব পাওয়া যায়। হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলে মদীনা মুনাওয়ারার ইহুদীদেরকে রোযা পালন করতে দেখলেন। এর কারণও সবার জানা আছে। অতঃপর হুজুর নিজেও রোযা রেখেছেন এবং মুসলমানদেরকেও রোযা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য, ইহুদীরা শুধু আশুরার দিনের রোযা পালন করে। তাদের বিরোধিতায় আমাদেরকে দুটি রোযা পালন করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী হুজুর-ই পাকের হাদীস শরীফের বরাতে আরো লিখেছেন- যে ব্যক্তি আশুরার দিন (বিশেষ) গোসল করবে, মৃত্যু ব্যতীত তাকে অন্য কোন

রোগ স্পর্শ করবে না, যে ব্যক্তি এ দিনে সুরমা (ইসমাদ) লাগাবে, গোটা বছর তার চোখে ছানি পড়বে না, যে ব্যক্তি আশুরার দিনে রোগীর পরিচর্যা করে, সে যেন সমস্ত বনী আদমের পরিচর্যা করে, যে ব্যক্তি এ দিনে মু'মিন বান্দাকে শরবৎ পান করায় সে যেন সমস্ত বনী আদমকে পিপাসার্ত অবস্থায় তৃপ্তি সহকারে পানি পান করায়। আর যে ব্যক্তি এ দিনে এভাবে চার রাকআত নফল নামায পড়ে, আল্লাহ ওই ব্যক্তির পঞ্চাশ বছর রাকআতে সে সূরা ফাতিহার পর ১৫ (পনের) বার সূরা ইখলাস শরীফ পড়বে। তদুপরি, তাঁর জন্য আল্লাহ তায়ালা হাজার নূরী মিম্বর তৈরী করাবেন। আরো একটি রেওয়ায়েতের সূত্রে আল্লামা ইবনুল জাওযী লিখেছেন যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বলেছেন- তাওরীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোযা রাখল, সে যেন গোটা যামানা রোযা রাখল।

আল্লামা ইবনুল জাওযী লিখেছেন- আশুরার রাত ও দিনে আল্লাহর রাহে ব্যয় করা মুস্তাহাব। কারণ, বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এ দিনে এক দিরহাম ব্যয় করবে, আল্লাহ তাকে সেটার বিনিময়ে সাত দিরহামের সাওয়াব ও বরকত দান করবেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, তোমরা আশুরার রাত ও দিনের মধ্যে তোমাদের ঘরগুলোর কল্যাণ বৃদ্ধি করো। আর তোমাদের পরিবার-পরিজনের জন্য উন্নতমানের হালাল পানাহারের ব্যবস্থা করো।

আমাদের দেশেও অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো আশুরার দিবস পালনার্থে প্রত্যেক সুন্নী মুসলমান অন্যান্য নেক কার্যাদির সাথে সাথে উন্নতমানের খাবার ও হাফতদানার ফাতিহার আয়োজন করে থাকেন্। এ প্রসঙ্গে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী আযীযুল হক শেরেবাংলা আলক্বাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'দীওয়ান-ই আযীয'-এর ১৭৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন-

১. আশুরার দিন নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্যকে প্রশস্ত করা (এ উপলক্ষে উন্নতমানের খাদ্য তৈরী করা) জায়েয বলে বর্ণিত হয়েছে।

২. আশুরার দিন সম্পর্কে হাদীস শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা এরশাদ করেছেন তা দেখে নাও। এতদসত্ত্বেও যারা এটা অস্বীকার করবে তার তো মুর্খের দল হবেই।

৩. ওই দিনে 'হাফতদানা' (সাতদানার ফাতিহা) ও জায়েয বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ওহে যুবক! এ কথা 'দুররে মুখতার'-এ দেখতে পারো।

৪. এর পর ফাতওয়া-ই শামীও দেখো!) এগুলোর পক্ষে অকাট্য দলীলাদি দেখে) সুন্নী মুসলমানদের মুখ আরো উজ্জ্বল হবে।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ প্রসঙ্গে তাঁর মাজমুআহ-ই-তাওয়া-ই আযীযিয়া'য় লিখেছেন-

'মাযাহির-ই-হক্ব': ২য় খন্ড কিতাবুয যাকাত, সাদকাহর ফজীলত শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে- হযরত ইবনে আবক্ষাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

"যে ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের জন্য খরচের বেলায় আশুরার দিন প্রশস্থতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা গোটা বছর-ই তার জন্য প্রাচুর্য দান করেন।" হযরত সুফিয়ান সওরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

আমরা এর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং এর অনুরূপই পেয়েছি। হযরত মুহাদ্দিস আবদুল হক্ব দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মা-সাবাতা বিসসুন্নাহয়, আল্লামা ইসমাঈল হক্কী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান' ১ম খন্ডে প্রায় কাছাকাছি বিষয়বস্তুর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

'ফাতাওয়া-ই শামী'তে আশুরার দিনে উন্নত খাবারের সাথে সাথে সুরমা লাগানোর কথা ও বর্ণিত করা হয়েছে। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-আমি চল্লিশ বছর যাবৎ এর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আর হাদীসে পাকের ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'ফাতাওয়া-ই শামীতে

(৫মখন্ড: কিতাবুল হাযর ওয়াল ইবাহত) প্রচলিত নিয়মে হাফত দানা'র কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 'দুররে মুখতার' এ এভাবে লেখা হয়েছে-প্রচলিত নিয়মে দানাগুলোর মিশ্রণে যে বিশেষ খাদ্য ও সেটার উপর ফাতিহার ব্যবস্থা করা হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ- তা অবৈধ নয়, বরং মুস্তাহাব ও ইবাদতের শামিল।

তাছাড়া, 'নুযহাতুল মাজালিস' ১ম খন্ডেও উপরোক্ত হাদীস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে। 'শরহে শির'আতুল ইসলাম'-এ আশুরার দিনের সুন্নাতসমূহের বিবরণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে- "ফকীর-মিসকীনদেরকে কাপড় ইত্যাদি দান করা, যিকির (আলোচনা) মাহফিলে হাযির হওয়া, শরবৎ পান করানো, ইয়াতীমদের মাথায় হাত বুলানো ও গোসল করা এ পবিত্র দিনের সুন্নাত সম্মত কার্যাদি।"

ওহাবীদের হাকীমুল উম্মত মৌং আশরাফ আলী থানভী সাহেবের 'বেহেশতী জেওর' ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠায়ও আশুরা পালনের সমর্থন রয়েছে। তাছাড়া 'জাওয়াহিরে গায়বী' কানযে পঞ্জুম: পৃষ্ঠা ৬১৪-৬১৬- এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুহাররম মাসের প্রথম দশ দিনে প্রতিদিন দু'রাকাত নফল নামায পড়বে, সালাম ফেরানোর পর হাজার বার দরূদ শরীফ পড়বে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেয়ায করবে, সে বড় সাওয়াবের অধিকারী হবে। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেনে রেখো, 'আশুরা' আল্লাহ তায়ালার নিকট বড়ই বরকতমন্ডিত দিন। নবীজী এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি সুন্নাতসম্মত উপায়ে এ দিন উদযাপন করলো, সে যেন হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করলো। এ দিনে দশটি সুন্নাত রয়েছে- ১. রোযা রাখা, ২. নফল নামায পড়া, ৩. ইয়াতীমের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দেওয়া, ৪. গোসল করা, ৫. বিরোধ মিটিয়ে পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া, ৬. রোগীর পরিচর্যা করা, ৭. পরিবার পরিজনের জন্য এবং মিসকীন ও গরীবদের উন্নত মানের খাদ্যাহারের ব্যবস্থা করা, ৮. আলিমে দ্বীনের যিয়ারতের জন্য গমন করা, ৯. সুরমা লাগানো এবং ১০. আল্লাহর মহান দরবারে বিশেষ দোয়া মুনাজাত করা।

ওহাবীদের বরেণ্য পুস্তক 'বেহেশতী জেওর' ৬ষ্ঠ খন্ড: ৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ দিনে আপন পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য-পানীয়ের প্রচুর ব্যবস্থা করে গোটা বছরই তার জীবিকায় বরকত হবে। হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভীর 'মালফুযাত' ও প্রকারান্তরে এসব সুন্নাত কাজের মাধ্যমে আশুরা পালনের সমর্থন পাওয়া যায়।

পরিশেষে, আশুরার দিনটি যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত কল্যাণ পাবারই দিন, তাই এ দিনে বিভিন্ন সুন্নাত সম্মত পন্থায় আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা চাই। তবেই আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন করতে গিয়ে শরীয়ত ও নৈতিকতা- বিরোধী কাজে লিপ্ত হবার মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা আসলে ওই দিবসকে বরণ কিংবা উদযাপন করা হতে পারে না। যেমন 'খ্রিস্টমাস ডে' ও 'থার্টি ফার্স্ট নাইট'-এ ইংরেজী নববর্ষ বরণ উপলক্ষে কিছু লোককে দেখা যায়।

অনুরূপ, মুসলমান নামধারী শিয়া সম্প্রদায় ও তাদের দোসররাও আশুরা দিবসে অনৈসলামিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘোড়ার মূর্তি ইত্যাদি তৈরী করে সেটাসহ নারী-পুরুষ একত্রে মিছিল করা, কোন কোন দেশে এ-ই শিয়াদের এ মিছিলে রশিতে ছুরি বেঁধে নিজেদের গায়ে আঘাত করা, মুখ ও বুক চাপড়িয়ে মাতম করা, এমনকি তাদের তথাকথিত ইমামবাড়াগুলোতে আশুরার রাতে 'নিকাহে মাত'আত (সাময়িক বিবাহ)'র নামে জঘন্য অবৈধ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর গযবের শিকার হওয়া অনিবার্য। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ দিনের প্রতি যথাযথভাবে শরীয়তসম্মত পন্থায় সম্মান দেখানোর তাওফীক দিন। আমীন।।

কারবালা

- সৈয়দা হাবিবুন নেসা দুলন

দোজখের চাবি
সেই দিন কোনদিন
যেই দিন কেঁপেছে জমিন!
যেই দিন কারবালা
হয়েছে রক্তে রঞ্জিণ।

কার রক্তে ওরে পাপীষ্ঠ
রাঙিয়েছিস কারবালা!
ওরাই তো তাঁরা, যাদের শানে
হয়েছে নাযিল "আয়াতে মোবাহালাচ।
নাছারা পাদ্রী ও করেনি সাহস
করিতে তাঁদের মোকাবেলা,
মুসলীম পরিচয়ে কেমন করে
ঘটিয়েছে লালে লাল কারবালা।

নুর নবীজির পবিত্র বাণী
"ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা
তাঁর কষ্ট আমাকে কষ্ট দেয়,
হায় বদনসীবের দল
যাহারা তনয়ের উপর
কেমন করে অস্ত্র তুলে নেয়!
নবীর বাণীকে তুচ্ছ করে
নবীর উম্মত দাবী করে,
নবী দৌহিত্রকে হত্যা করে
মুসলীম বলে দাবী করে।

হতে কি পারে ওরা মুসলমান!
না, ওরা পথভ্রষ্ঠ, ওরা বেঈমান।
মাথায় টুপি মুখে দাঁড়ি
বলতো ওরা নামাজি,
সত্যিই কি তারা ছিলো নামাজি!
নাকি সবই ছিলো ভোজবাজি,
শেষ পর্য ন্ততাই বুঝি হবে
তাদের জন্য দোজখের চাবি।

সাবধান, সাবধান
ওহে মুসলমান,
কারবালা প্রান্তরেই
হয়েছে প্রমাণ,
ওরা শুধু মুখেই বলতো
মানে আল কুরআন।

আজো আছে ভোরাকাটা
বদনসীবের চেলা,
আহলে বায়াতের প্রেম
দেয়না তাদেরে দোলা।

ওহে প্রেমিক হুসাইনী সেনা
বজ্রকণ্ঠে তোল আওয়াজ,
ওদের প্রতি লানত দেওয়া
নিশ্চয় মহা পূন্যের কাজ।

আহলে বায়াতের প্রেমই
আমাদের মুক্তির পথ,
যে পথে বর্ষে সদা
খোদার রহমত।

হে রহিম রহমান
মাবুদ সুমহান,
আহলে বায়াতের প্রেমে
মোদের কর আওয়ান।

গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা
গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ

গ্রামঃ সেকদী, ডাকঘরঃ বাগড়া বাজার, থানাঃ ফরিদগঞ্জ, জেলাঃ চাঁদপুর।

আবেদন

সম্মানীত অভিভাবকবৃন্দ
আস্সালামু আলাইকুম

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেকদী গ্রামে হযরত বড়পীর গাউছুল আ'যম সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর স্মৃতিস্বরূপ গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ, গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও গাউছুল আ'যম এতিমখানা নামে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ সুন্নী আক্বিদা ভিত্তিক কোরআনে হাফিজ, ইসলামী জ্ঞানে পরিপূর্ণ আলেম গড়া ও প্রকৃত দরিদ্র এতিমের সাহায্য ও পূর্নবাসনের লক্ষ্যেই এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

১। স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত সুন্দর পরিবেশে থাকার-সু-ব্যবস্থা।
২। অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন মজিদ শিক্ষাদান।
৩। মেধাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা।
৪। প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সুন্দর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত।
৫। সার্বক্ষণিক বৈদ্যুতিক জেনারেটরের ব্যবস্থা।

ভর্তির যাবতীয় তথ্য ও ফরম সংগ্রহের জন্য মাদ্রাসা অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঃ আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
'জিহাদ ভবন' ১৩৪ শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ০১৮১৮-২২৯২৯১, ৮৩৫৬৬৯১

পোঃ রেজিঃ নং- ডি এ ঢাকা ৫০২৮, ১৮৭ তম সংখ্যা, অক্টোবর'১৬ ইং, মূল্য ১৫.০০ টাকা

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল সাহেবের লিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্[illegible] [illegible]ড়ন এবং আক্বিদা শুদ্ধ করুন

	হাদিয়া
হায়াত মউত কবর হাশর	৪০০.০০
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	২৫০.০০
আ'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'	১৩০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	১৫০.০০
ফতোয়ায়ে হালাবীন বা ত্রিশ ফতোয়া	৮০.০০
আহকামুল মাযার	৮০.০০
শিয়া পরিচিতি	৬০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	৬০.০০
ফতোয়া ছালাছা	৩০.০০
ইসলামে [illegible] (সাদা)	৭০.০০
কালেমা[illegible]	৮০.০০
কারবা[illegible]	৫০.০০
বালাগা[illegible] [illegible]কিফাত	(নিঃশেষ)
গোলা[illegible]	(নিঃশেষ)
ফতোয়া[illegible]	(নিঃশেষ)
সফর [illegible]	(নিঃশেষ)
দিলে মিলাদ[illegible] [illegible] নাহরী	(নিঃশেষ)
মহাগ্রন্থের [illegible]	(পান্ডুলিপি)

প্রাপ্তি ঠিকানা : খানকায়ে জলিলিয়া, ১৩২/৩ আহমদবাগ, (২য় লেন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ফোন : ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-৯০৬৯৯৬

বিঃদ্রঃ ৫০০০ টাকার পাইকারগণের জন্য ২০% কমিশন। ৫০০ টাকা হলে বিনা কমিশনে ভিপি করেও পাঠানো হয়।

সুন্নী মুবাল্লিগ ও সুন্নীবার্তার এজেন্সী ঠিকানা

উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা।

গাউছিয়া জলিলিয়া দরবার কমপ্লেক্স
আমিয়াপুর, পাঠান বাজার মতলব, চাঁদপুর।

গাউসুল আযম হাফেজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা ও জামে মসজিদ
সেকদী, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

পীরে তরিকত মাওঃ হেলাল উদ্দিন
চিলাকড়া নুরিয়া দরবার শরীফ
কোনালিয়া, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।

মোঃ আঙ্গুর মিয়া
গাউসিয়া জামে মসজিদ, নদীর পাড়, ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ।

মাও ঃ মোঃ নওশেরুজ্জামান
নৈকটি সিরাতুন্নবী দাখিল মাদ্রাসা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

মিডিয়া প্লাস
নূর ম্যানসন, চকবাজার, কুমিল্লা।

মাওঃ গোলাম গাউস
এনায়েতপুর দরবার শরিফ, দারাশা তুলপাই, কচুয়া, চাঁদপুর।

আলহাজ্ব ডাঃ আনওয়ার হোসেন
গ্রাম+পোঃ হাসিমপুর, রায়পুরা, নরসিংদী।

মাওলানা মুফতী ফারুক আহমেদ
সুপার, আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রা.) মহিলা মাদ্রাসা মতলব (উত্তর), চাঁদপুর।

পীরে তরিকত জামাল উদ্দিন মোমেন
কুতুবিয়া দরবার শরীফ, চৌধুরী বাড়ী, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

মুফতি এম.এ. তাহের
অধ্যক্ষ, আবেদনগর সুন্নিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, চাঁনগাঁও, লাকসাম, কুমিল্লা।

মোঃ এরফান শাহ (ফারুক)
সাং-ভরাট শিবপুর বড় পাটবাড়ী, পোঃ কাশিমপুর (দক্ষিণ), হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

খড়িয়ালা দরবার শরীফ
আশুগঞ্জ ষ্টেশন রোড, বি-বাড়ীয়া।

মোহাম্মদ ফাহিম কাদেরী
খাজা হার্ডওয়ার ষ্টোর, টি আর রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

সুফী আঃ গফুর
খানকায়ে গাউছিয়া ইউএম.সি. পুরাতন কলোনী, নরসিংদী।

মাওলানা আবু সুফিয়ান আল-কাদেরী
কাদেরীয়া চিশতিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসা বদরপুর, পোঃ হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

আমজাদ হোসেন
হেলাল মাইক সার্ভিস, থানা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ।

মাওঃ আবুল কাসেম নূরী
রাণীখার, আখাউরা, বি-বাড়ীয়া।

ডাঃ শহীদুল্লাহ্
উপশম হোমিও হল, শিবপুরবাজার, নরসিংদী।

মাওঃ শাহজাহান চিশ্তি
খতীব, তাড়ুয়াকান্দি মাঝে মসজিদ, মঙ্গলের গাঁও, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

গাউসিয়া সোবহানিয়া দাঃ মাদ্রাসা
ভুমুরিয়া, কচুয়া, চাঁদপুর।

মোশারফ হোসেন
চিশতী মেডিকেল হল
পীর কাশিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

মর্তুজা আলী
মর্তুজাষ্টোর চুনারুঘাট, জেলা: হবিগঞ্জ।

সূফী আলহাজ্ব খন্দকার মহিউদ্দীন
সূফী দরবার শরীফ, মহিষমারী, হোমনা, কুমিল্লা

হযরত শাহজালাল (র.) জামে মসজিদ
বারকাউনিয়া (বড় বাড়ী), তিতাস, কুমিল্লা।

সৈয়দ মতিউর রহমান আশরাফী
আঙ্গুয়াদী, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।

ডাঃ আবদুল মোতালেব চৌধুরী
নবীনগর পশুহাসপাতাল, বি-বাড়ীয়া।

আলহাজ্ব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
খাদেমে তরিকত, তরিকায়ে মোজাদ্দেদিয়া কেন্দ্রীয় খানকা ও মাজার শরীফ, ৩১৩-পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আলি আশ্রাফ মজুমদার
নিজ মেহার (চৌধুরী বাড়ী), শাহরাস্তী, চাঁদপুর।

ডাঃ আবদুল করিম
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, পীরগাজর সাতক্ষীরা।

মো ঃ আজাদ মিয়া
মিরপুর, ঢাকা।

জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, ২০৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা। ফোন : ৭১৯৪০২০, মোবাইল : ০১৭১১-১৭৬৭২৩ (প্রচ্ছদ অলংকরণ: মুহাম্মদ মাহদী হাসান তুহিন)

ডাঃ দিলারুবা ইয়াসমীন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল কাদরী প্রিন্টার্স, ১০০/৪, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯৩১১৮০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com, Website: http://Sunnibatta.wordpress.com